বার্ষিকী-২০০৮

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি

সন্দীপন

১৯৯০
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

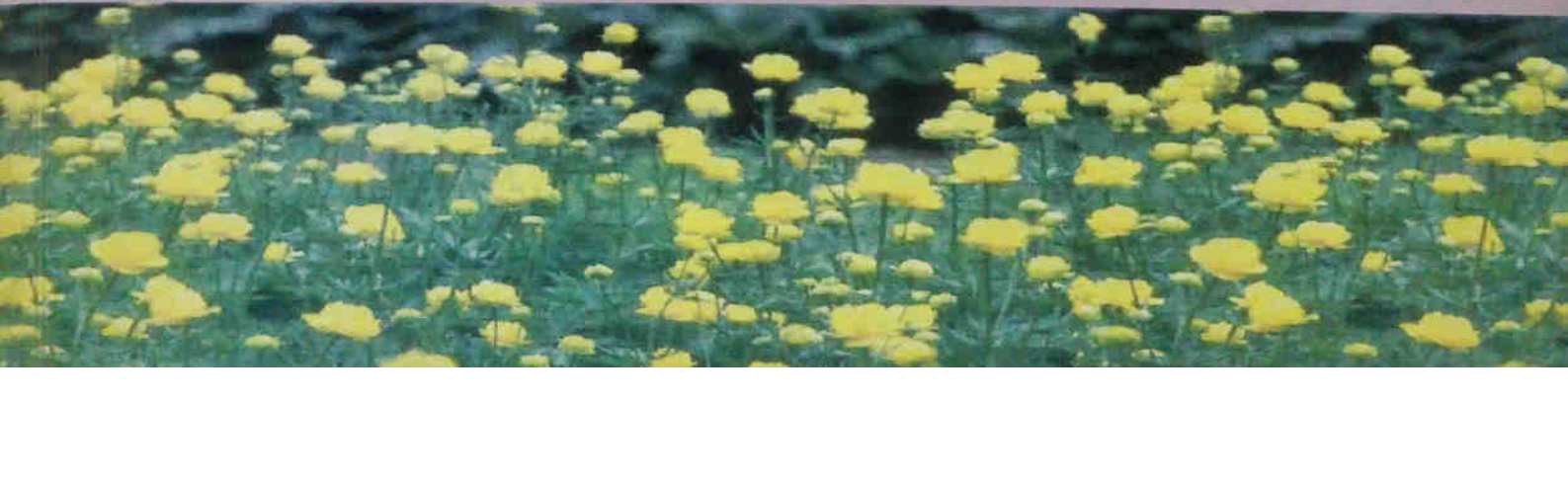

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
DHAKA RESIDENTIAL MODEL COLLEGE
প্রশাসন ভবন

সন্দীপন

কলেজ বার্ষিকী ২০০৮

১৯৬০

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বার্ষিকী-২০০৮
মিরপুর সড়ক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশক
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
মিরপুর সড়ক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
ফেরদৌস আরা বেগম, সহযোগী অধ্যাপক
নিশাত হাসান, সহকারী অধ্যাপক
মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক, সহকারী অধ্যাপক
মোহাম্মদ নূরুন্নবী, সহকারী অধ্যাপক

প্রচ্ছদ
রতন সরকার, প্রভাষক

অঙ্গসজ্জা
মাহবুবা হাবিব, প্রভাষক
মির্জা তানবীরা সুলতানা, প্রভাষক
রতন সরকার, প্রভাষক
নুরুন্নাহার, প্রভাষক

আলোকচিত্র
জে.এম আরিফুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, ইউ.ডি.এ

ডিজাইন প্রসেস
মোঃ আমিনুল ইসলাম
এ্যাপোলো প্রিন্টার্স

মুদ্রণ
এ্যাপোলো প্রিন্টার্স
১৭ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫

শিক্ষা সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি
বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

অধ্যক্ষ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মিরপুর সড়ক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১১৮৮৩৪, ফ্যাক্স : ৯১২৯৯১৭

অধ্যক্ষের বাণী

আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এ আত্মপ্রকাশ যখন ভাষিক ও শৈল্পিক হয়ে ওঠে তখন তা লাভ করে সাহিত্যিক মর্যাদা । সাহিত্যের উদ্দেশ্য সত্য, সুন্দর ও আনন্দ। সাহিত্য ভালোকে সুন্দর, শ্রেয়কে প্রিয় এবং পুণ্যকে হৃদয়ের ধন করে তোলে। তাই সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন উন্নত ও উপযুক্ত প্রকাশ মাধ্যম। বিশেষত শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রকাশ মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ নিয়মিতভাবে হাউস ভিত্তিক বার্ষিক দেয়াল পত্রিকা ছাড়াও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকাশ করে থাকে কলেজবার্ষিকী। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হল ২০০৮ সালের কলেজবার্ষিকী সন্দীপন। কলেজবার্ষিকীর এ আত্মপ্রকাশে অধ্যক্ষ হিসেবে আমি আনন্দ ও গৌরব অনুভব করছি।

সন্দীপন ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের দর্পণ। এ দর্পণের অবয়বে ফুটে উঠেছে প্রতিষ্ঠানের সাংবাৎসরিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের প্রতিচ্ছবি। সন্দীপনে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা যেমন লিখেছে, তেমনি তাদেরকে সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করার জন্য লিখেছেন শিক্ষকমণ্ডলীও । নবীন শিক্ষার্থী-লেখকদের মধ্যে হয়ত লুকিয়ে আছে অনাগতকালের অনেক খ্যাতিমান লেখক-সাহিত্যিক। বার্ষিকী প্রকাশের এ শুভক্ষণে তাদের প্রতি রইল আমার শুভকামনা ও আশীর্বাদ।

যাঁদের নিরলস শ্রম, সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় সন্দীপন প্রকাশিত হল তাঁদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

কর্নেল মোঃ কামরুজ্জামান খান

সম্পাদকীয়

বছর ঘুরে আবার প্রকাশিত হলো আমাদের কলেজবার্ষিকী সন্দীপন। বিগত এক বছরের শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরা এবং তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভার জাগরণ ও বিকাশই এ বার্ষিকীর উদ্দেশ্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এ বছর প্রচুর লেখা জমা পড়ে। কিন্তু সঙ্গত কারণে সব লেখা প্রকাশ করা সম্ভবপর হলো না। যে লেখাগুলো মনোনীত এবং প্রকাশিত হলো আশাকরি সেগুলো সহৃদয় পাঠকের ভালো লাগবে। শিক্ষার্থী লেখকদের কেউই পরিণতবয়স্ক নয়– অনেকেরই সাহিত্য রচনার এটাই হাতেখড়ি। নবীন ক্ষুদে লেখকদের লেখার ভুলত্রুটি সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশাকরি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের লেখা নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে এ বছরের সন্দীপন। সর্নিবন্ধ অনুরোধে সাড়া দিয়ে কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকাও লিখেছেন এতে। তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন।

বার্ষিকী কমিটির সকল সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতা, অফিসের কম্পিউটার কর্মীদের নিরলস শ্রম, সর্বোপরি অধ্যক্ষ মহোদয়ের সক্রিয় নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা বার্ষিকীর প্রকাশনাকে দ্রুততর করেছে। তাঁদের সবার প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ এর

বোর্ড অব গভর্নরস এর সম্মানিত সদস্যগণের তালিকা

- **মোঃ মোমতাজুল ইসলাম**
  সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (চেয়ারম্যান)

- **প্রফেসর খান হাবিবুর রহমান**
  মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
  মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (সদস্য)

- **প্রফেসর মোঃ মনিরুল ইসলাম**
  চেয়ারম্যান
  মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (সদস্য)

- **জনাব মাইন উদ্দিন খন্দকার**
  যুগ্মসচিব
  সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (সদস্য)

- **জনাব প্রণব চক্রবর্তী**
  যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (সদস্য)

- **ড. এম উমার আলী**
  অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
  অভিভাবক প্রতিনিধি (সদস্য)

- **ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া**
  অধ্যাপক, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
  অভিভাবক প্রতিনিধি (সদস্য)

- **জনাব মোঃ মোস্তফা**
  সহকারী অধ্যাপক
  শিক্ষক-প্রতিনিধি, প্রভাতী শাখা (সদস্য)

- **জনাব মোঃ বাকাবিল্লাহ**
  প্রভাষক
  শিক্ষক-প্রতিনিধি, দিবা শাখা (সদস্য)

- **কর্নেল মোঃ কামরুজ্জামান খান**
  অধ্যক্ষ
  ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ (সদস্য-সচিব)

কলেজ বার্ষিকী সন্দীপন-২০০৮

পৃষ্ঠপোষক

কর্নেল মোঃ কামরুজ্জামান খান

অধ্যক্ষ

উপদেষ্টা-পরিষদ

১। মোঃ নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া	:	উপাধ্যক্ষ, প্রভাতী শাখা
২। এ বি এম শহীদুল ইসলাম	:	উপাধ্যক্ষ, দিবা শাখা
৩। সুলতান উদ্দিন আহমেদ	:	উপাধ্যক্ষ (চলতি দায়িত্ব), প্রভাতী- জুনিয়র শাখা
৪। ফেরদৌস আরা বেগম	:	সহযোগী অধ্যাপক
৫। কামরুন নাহার খানম	:	সহকারী অধ্যাপক (সমন্বয়কারী, দিবা-জুনিয়র শাখা)

সম্পাদনা-পরিষদ

১। নিশাত হাসান, সহকারী অধ্যাপক	:	আহ্বায়ক
২। ড. মোঃ নূরুন নবী, সহকারী অধ্যাপক	:	সদস্য
৩। জেহিন বেগম, সহকারী অধ্যাপক	:	সদস্য
৪। মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক	:	সদস্য
৫। মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক, সহকারী অধ্যাপক	:	সদস্য
৬। ফারহানা রহমান, সহকারী অধ্যাপক	:	সদস্য
৭। মাহবুবা হাবিব, প্রভাষক	:	সদস্য
৮। রতন কুমার সরকার, প্রভাষক	:	সদস্য
৯। রুমানা আফরোজ, প্রভাষক	:	সদস্য

ছাত্র-সদস্যবৃন্দ

১। দীপেশ দেওয়ান	:	দ্বাদশ বিজ্ঞান
২। মাহদী আল মাসুদ	:	একাদশ বিজ্ঞান
৩। সাদী মোঃ জাওয়াদ আহসান	:	একাদশ বিজ্ঞান

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা

প্রশাসন শাখা

১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা	:	মোঃ মফিজুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)
২। সুপারিনটেনডেন্ট	:	মোঃ নূরুল হুদা
৩। প্রধান সহকারী	:	মোঃ খলিলুর রহমান
৪। উচ্চমান সহকারী	:	রওশন আরা বেগম
৫। উচ্চমান সহকারী	:	মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
৬। নিম্নমান সহকারী	:	মোঃ ছানাউল্লাহ

হিসাব শাখা

১। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	:	মোঃ মফিজুর রহমান
২। হিসাব রক্ষক	:	ফরিদ আহম্মেদ (দিবা শাখা)
৩। হিসাব রক্ষক	:	আব্দুল্লাহ মুর্শিদ
৪। হিসাব সহকারী	:	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
৫। উচ্চমান সহকারী	:	মোসাম্মৎ তহমিনা খানম
৬। নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	:	আব্দুর রহিম
৭। নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	:	ফারহানা আফরোজ

হোস্টেল সেকশন

১। মেট্রন	:	রওশন আরা সাথী
২। স্টুয়ার্ড	:	মোঃ ইখতিয়ার হোসেন তালুকদার
৩। স্টুয়ার্ড	:	হাসনাত মোহাম্মদ আব্দুল হাই

মেডিকেল সেকশন

১। মেডিকেল অফিসার	:	ডাঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম
২। ফার্মাসিস্ট	:	মোহাঃ গোলাম মোস্তফা

লাইব্রেরি, টেক্সটবুক এবং স্টেশনারি

১। লাইব্রেরিয়ান	:	সামসুন নাহার তোরণ
২। ক্যাটালগার	:	মোঃ মতিয়ার রহমান
৩। টেক্সটবুক স্টুয়ার্ড	:	মোহাম্মদ আফজাল হোসেন

স্টোর ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা

১। উপ-সহকারী প্রকৌশলী	:	মজিবুর রহমান
২। স্টোর কিপার	:	সৈয়দ শাব্বির আহমেদ
৩। স্টোর কিপার	:	মোঃ অছিউর রহমান (দিবা শাখা)
৪। স্টোর অ্যাসিসটেন্ট	:	মোহাম্মদ সুহেল রানা

গ্রাউন্ড ও সিকিউরিটি সেকশন

১। কেয়ারটেকার	:	মোঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো
২। প্রধান মালি	:	মোঃ ইউসুফ ব্যাপারী
৩। প্রধান নৈশ প্রহরী	:	মোঃ আমিনুল হক (ভারপ্রাপ্ত)

এম.টি সেকশন

১। গাড়ি চালক	:	আব্দুল খালেক
২। গাড়ি চালক	:	মোঃ শহীদ উল্লাহ

কলেজ অডিটোরিয়াম

সম্পাদনা পরিষদের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষবৃন্দ ও শিক্ষক প্রতিনিধিদ্বয়

কর্নেল মোঃ কামরুজামান খান
অধ্যক্ষ

প্রভাতী শাখার শিক্ষকবৃন্দ

মোঃ নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া
উপাধ্যক্ষ

সুলতান উদ্দিন আহমেদ
উপাধ্যক্ষ (চলতি দায়িত্ব), জুনিয়র

সহযোগী অধ্যাপক

ফেরদৌস আরা বেগম
বাংলা বিভাগ

ইরশাদ আহমেদ শাহীন
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ নজরুল ইসলাম
ইতিহাস বিভাগ

সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মোস্তফা
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আব্দুল লতিফ
গণিত বিভাগ

নিশাত হাসান
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ মনজুরুল হক
গণিত বিভাগ

ড. মোঃ নূরুন নবী
ইংরেজি বিভাগ

জেহিন বেগম
বাংলা বিভাগ

রওশন আরা বেগম
ইসলামের ইতিহাস বিভাগ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ ফিরোজ খান
পরিসংখ্যান বিভাগ

শাহীন আখতার
বাংলা বিভাগ

মোঃ হায়দার আলী
বাংলা বিভাগ

সাবেরা সুলতানা
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ মেসবাউল হক
ইংরেজি বিভাগ

মোহাম্মদ নুরুন্নবী
যুক্তিবিদ্যা বিভাগ

রানী নাছরীন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

প্রভাষক

মাহবুবা হাবিব
চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী
অর্থনীতি বিভাগ

মির্জা তানবীরা সুলতানা
চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

নাসরীন বানু
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

মোঃ আনোয়ার হোসেন
গণিত বিভাগ

মোঃ জাহেদুল হক
রসায়ন বিভাগ

প্রশান্ত চক্রবর্তী
গণিত বিভাগ

মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মোঃ তারেক খান
ইংরেজি বিভাগ

আসাদুল হক
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ ওমর ফারুক
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

সামীয়া সুলতানা
অর্থনীতি বিভাগ

সামসুন্নাহার তোরণ
গ্রন্থাগারিক

সহকারী শিক্ষক

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

মোঃ খলিলুর রহমান
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

মোঃ নুরুল ইসলাম
কৃষি শিক্ষা বিভাগ

ভারত চন্দ্র গৌড়
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

প্রদর্শক

আব্দুল মোমেন খান
ভূগোল বিভাগ

মানিক চন্দ্র ঘোষ
রসায়ন বিভাগ

এম এম ফজলুর রহমান
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ ছানাউল হক
জীববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ মনির হোসেন গাজী
গণিত বিভাগ

দিবা শাখার শিক্ষকবৃন্দ

এ বি এম শহীদুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ

সহকারী অধ্যাপক

কামরুন নাহার খানম
বাংলা বিভাগ

আসমা বেগম
জীববিজ্ঞান বিভাগ

ফাতেমা জোহরা
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

ড. সৈয়দা খালেদা জাহান
বাংলা বিভাগ

মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ
গণিত বিভাগ

ফারহানা রহমান
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ লোকমান হাকিম
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

জে.এম আরিফুর রহমান
রসায়ন বিভাগ

সুদর্শন কুমার সাহা
গণিত বিভাগ

রাশেদ আল মাহমুদ
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
ইংরেজি বিভাগ

প্রভাষক

মোঃ আনোয়ার সাহাদাত
পরিসংখ্যান বিভাগ

মোঃ আরিফুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ

রতন কুমার সরকার
চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোঃ বাকাবিল্লাহ
ইতিহাস বিভাগ

অনাদিনাথ মণ্ডল
গণিত বিভাগ

আখতার জাহান ফেরদৌসী বানু
কম্পিউটার বিভাগ

ত.ম. মালেকুল এহতেশাম লালন
বাংলা বিভাগ

ইফফাত আফরীন নাজ
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
গণিত বিভাগ

প্রসেনজিৎ কুমার পাল
রসায়ন বিভাগ

খোদেজা বেগম
অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ শাহরিয়ার কবির
বাংলা বিভাগ

মোঃ আলমগীর হোসেন মৃধা
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

নার্গিস জাহান কনক
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

রুমানা আফরোজ
বাংলা বিভাগ

প্রসূন গোস্বামী
ইংরেজি বিভাগ

মোহাম্মদ সেলিম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

হাফিজ উদ্দিন সরকার
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

জাকিয়া সুলতানা
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

নুরুন্নাহার
চারু ও কারুকলা বিভাগ

ফাতেমা নূর
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আয়নুল হক
ইংরেজি বিভাগ

সহকারী শিক্ষক

মোঃ শামসুজ্জোহা
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

মোঃ আবু তৌহিদ মিয়া
কৃষি শিক্ষা বিভাগ

মোঃ খায়রুল আলম
কৃষি শিক্ষা বিভাগ

মোঃ ফারুক হোসেন
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

মোঃ মহিউদ্দিন
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

সৈয়দ আহমেদ মজুমদার
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

প্রদর্শক

জি.এম এনায়েত আলী
জীববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ কামাল হোসেন
কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ ফরহাদ হোসেন
ভূগোল বিভাগ

কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

জয়নুল আবেদীন হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

ফজলুল হক হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

লালন শাহ হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

কলেজ কেন্দ্রীয় মসজিদ

কলেজ কেন্দ্রীয় মসজিদের অভ্যন্তর

সূচিপত্র

ছড়া ও কবিতা	পৃষ্ঠা	লেখক
উন্নয়নের গতিধারায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ	২৯	মুহম্মদ হায়দার আলী
শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ	৩৪	সাবেরা সুলতানা
হাউস প্রতিবেদন	৪১	কলেজের ছয়টি হাউস
কাক ডাকা ভোরের আগে	৪৭	কর্নেল মোঃ কামরুজ্জামান খান
ফাল্গুনী	৪৭	কর্নেল মোঃ কামরুজ্জামান খান
আমার মা	৪৮	সালেহ আব্দুল্লাহ (অর্ঘ্য)
সন্ধ্যা নামে	৪৮	অরিত্র রায়হান
অরণ্যের টানে	৪৮	মোঃ রাইসুল ইসলাম
সেদিন আমি তোমার হব	৪৮	তৌকির মুজিব
রান্না	৪৯	জিহান আল হামাদী
গ্রামীণ সকাল	৪৯	মোঃ আশরাফুল রহমান
স্বপ্নের রেশ	৪৯	মোঃ সাহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া
স্মৃতি মাখা দিন	৫০	মোঃ শিবলী সাদিক
চাওয়া	৫০	বিজয় সরকার
জয়তু গণিত	৫১	অনাদিনাথ মণ্ডল
দিশারী	৫১	মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
মুক্তি	৫১	মোঃ শাহরিয়ার কবির
যত্ন	৫১	আনোয়ার সাহাদাত

গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণ-কাহিনী

আমার হাউস জীবন	৫২	এ এ এম ফাইয়াজ রাহমান
ঘুরে এলাম সুন্দরবন	৫২	শাফকাত ইসলাম
অন্য রকম প্রতিশোধ	৫৩	রাইয়ান ইবনে ফয়েজ
কল্পকথা	৫৪	মোঃ ফাহাদ রহমান
ক্ষুদে ড্রাইভারের কীর্তি	৫৫	ঐশিক রহমান সিদ্দিকী
অপূর্ব স্বস্তি	৫৭	মোঃ নাহিদ ইসলাম
জীবন-জীবিকার কথকতা	৫৮	আব্দুল্লাহ ইনাম তালহা
ভিনদেশের কথকতা	৬০	দীপেশ দেওয়ান
অনুশোচনা	৬২	রুমানা আফরোজ
বাউলসম্রাট লালন শাহ্ : জীবন ও কীর্তি	৬৩	মুহম্মদ হায়দার আলী
বাংলাদেশের দ্বীপ ভোলা : সিডর এবং আমার ভাবনা	৬৫	রওশন আরা বেগম
কী হেরিলাম হৃদয় মেলে	৬৭	জেহিন বেগম
পরিবেশ বান্ধব	৭০	কামরুন নাহার খানম
নিজ বাড়ি	৭১	ফেরদৌস আরা বেগম
জানা-অজানা	৭৩	মাহির ফয়সাল
বিজ্ঞানের অজানা রহস্য :	৭৪	আইনুল ইসলাম
খেলাধুলা বিষয়ক তথ্য-বিচিত্রা	৭৫	পীয়্যান মুগ্ধ নবী,
খেলাধুলা নিয়ে কিছু তথ্য	৭৫	সামনুন সালেহীন সৌরভ
মডেল প্যাঁচালি	৭৬	সৌরভ, মাহদী, জাওয়াদ, জাহিন
কৌতুক	৮১	অর্ণব, ফাহাদ,সামিউল, জায়েদ, সাদাব, নাদিম, দেবাশিষ, অনুপ।

English Section

To My parents	92	Shovon-bin-Yousuf
To Our Beloved Last Prophet	92	Mohaiminul Islam
Safety First	92	Farhanul Karim
Little Bird	92	Faisal Bin Alam
Enlighten Me	93	Razu Hossain Khan
If I Can	93	Md. Nazmul Islam
The Last Moment	93	Ishraq Elahi
Friendship	93	Mahmudul Haq Khan
My Friend	94	Taufiq Yeasin Sunny
Your History	94	Mithun Kumar Dey
Ridders & Jokes	95	Shanim Ahmed Soumik, Nafis Irteesham
Some Information	96	
World Cup Legends		Md. Nomanur Rashid
World'S Festivals		C.M Muktadir
Some Question and answers	97	Sadi M. Jawad Ahsan
Prose : A VISIT TO COX'S BAZAR	98	Md. Asif Bin Rashid
Funny Gift	99	Mahinul Islam Meem
A Nightmare	99	Shourav Banik
Celebration Of Special Days!!!	100	Md. Forhad Hossain
Don'T Ask Me Why	101	Prasun Goswami
Shape of our Imagination	104	Mirza Tanbira Sultana
How Did I Learn English ?	107	Md. Mostafa
A Few Simple Words	109	A. B. M. Shahidul Islam

মনের রঙে যেমন খুশি আঁকো

ইরফান আহমেদ,
কলেজ নম্বর : ৯৫২০
শ্রেণী : সপ্তম (প্রভাতী)

মাহজিব হোসেন
কলেজ নম্বর : ৯৭৯৩
শ্রেণী : ষষ্ঠ (প্রভাতী)

নাহিয়ান আক্তার
কলেজ নম্বর : ৯৮০৯
শ্রেণী : ষষ্ঠ (প্রভাতী)

আহসানুল রিফাত
কলেজ নম্বর : ১০৪৩৯
শ্রেণী : নবম (প্রভাতী)

উন্নয়নের গতিধারায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মুহম্মদ হায়দার আলী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া কেবল অত্যাবশ্যক নয়– অপরিহার্য। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় যেমন যে-কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের মহিমান্বিত চূড়ায় উপনীত হতে পারে, তেমনি ধারাবাহিক উন্নয়নের গতি রুদ্ধ হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বক্ষেত্রে নেমে আসতে পারে স্থবিরতা, ব্যর্থতা ও বন্ধ্যাত্বের কালো ছায়া। এ কারণে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ধারাবাহিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তার উৎকর্ষ সাধনে সদা অঙ্গীকারবদ্ধ।

বিগত দেড় বছরে অত্র কলেজে নানামাত্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এসব উন্নয়ন কার্যক্রমকে মোট ৪টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে :

ক। অবকাঠামোগত উন্নয়ন
খ। শিক্ষা-সহায়ক উন্নয়ন
গ। শোভাবর্ধক উন্নয়ন
ঘ। প্রশাসন সংক্রান্ত উন্নয়ন

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

❖ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ মূলত একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের প্রভাতী শাখার ছাত্রদের জন্য ৫টি আবাসিক হাউস (ছাত্রাবাস) থাকলেও এতদিন দিবা শাখার ছাত্রদের জন্য কোনো আবাসিক হাউস ছিল না। এজন্য সরকারি অর্থানুকূল্যে নব নির্মিত ৫তলা হাউসটি দিবা শাখার ছাত্রদের জন্য চালু করা হয়েছে। বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নামে নতুন চালুকৃত হাউসটির নামকরণ করা হয়েছে 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস'। দিবা শাখার ছাত্রদের আবাসিক চাহিদা ও সংকটের কথা বিবেচনা করে সরকারি আসবাবপত্র সরবরাহের আগেই অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় আসবাবপত্র তৈরি/সংগ্রহ করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে হাউসটির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

❖ শিক্ষাভবন-২ এর সম্মুখস্থ সুবিশাল বটতলাটি এ কলেজের সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র। মহান একুশ উপলক্ষে বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ছাড়াও স্বাধীনতা দিবস, বাংলা নববর্ষ প্রভৃতি উৎসব-অনুষ্ঠান উদযাপনে বটতলা মুখর থাকে সারা বছর। বটতলার এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এর চারপাশে সুদৃশ্য টাইলস্ দ্বারা মঞ্চোপম নান্দনিক পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

❖ প্রশাসনভবন, শিক্ষাভবন, ছাত্রদের আবাসিক হাউস, অডিটোরিয়াম, হাসপাতাল এ কলেজের অবকাঠামোর প্রধান অংশ। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে এগুলোর কার্যক্ষমতা ও সৌন্দর্য হ্রাস পেতে বসেছিল। কলেজের নিজস্ব লোকবল দ্বারা এসব ভবনের প্রয়োজনীয় রিপেয়ারিং, প্লাস্টার, আসবাবপত্র মেরামত, বৈদ্যুতিক লাইন সংস্কার এবং ভেতরে ডিসটেম্পার ও বাইরে স্নোসেম রংকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

❖ কলেজের দর্শনীয় পাখিঘরটিতে যাতায়াতের কোনো সুনির্দিষ্ট পথ ছিল না। এছাড়া পাখিঘরের চারপাশে দাঁড়িয়ে পাখি দেখার মতো উপযুক্ত পরিবেশও ছিল না। এ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে মূল রাস্তা থেকে পাখিঘর পর্যন্ত একটি সুদৃশ্য পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে এবং পাখিঘরের চারপাশে দাঁড়ানোর জন্য ইট ও টাইলস্ এর প্রশস্ত দর্শক-গ্যালারি নির্মাণ করা হয়েছে।

❖ শিক্ষাভবন-১ এ কম্পিউটার ল্যাব. থাকলেও শিক্ষাভবন-২ এ কোনো কম্পিউটার ল্যাব. ছিল না। ফলে শিক্ষাভবন-২ এর ছাত্রদেরকে শিক্ষাভবন-১ এ গিয়ে কম্পিউটার ক্লাস করতে হত। এ সমস্যার সমাধানের জন্য শিক্ষাভবন-২ এ একটি অত্যাধুনিক জুনিয়র কম্পিউটার ল্যাব. স্থাপন করা হয়েছে। এতে জুনিয়র ছাত্রদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ সহজতর ও সুখকর হয়েছে।

❖ প্রশাসনভবনের পুরোনো কম্পিউটারগুলো মেরামত করে সচল করা হয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক কাজে আরো গতি সঞ্চারের প্রয়োজনে ০৪ টি নতুন কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে।

❖ ছাত্র ও শিক্ষকদের নানামুখী প্রশিক্ষণ প্রদান, ফলাফল সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের বিনোদন ইত্যাদির প্রয়োজনে ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং ওভারহেড প্রজেক্টর ক্রয় করা হয়েছে।

❖ ছাত্রদের আবাসিক হাউসগুলোতে পুরোনো ও প্রায়-অকেজো টেলিভিশনগুলো পরিবর্তন করে ২৯ ইঞ্চি রঙিন নতুন টেলিভিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ছাত্রদের খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় সংরক্ষণের সুবিধার্থে জুনিয়র হাউসগুলোতে ১৮ সিএফটির একটি করে রেফ্রিজারেটর সরবরাহ করা হয়েছে।

❖ একাদশ শ্রেণীর দু'টি নতুন শাখার ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষের জন্য ১৫০ সেট প্লাস্টিকের চেয়ার-টেবিল ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া হাউসগুলোর কমনরুমে ছাত্রদের বসার জন্য ২৫০ টি প্লাস্টিকের চেয়ার ক্রয় করা হয়েছে।

❖ কলেজে ক্রমাগত ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ১টি নতুন শিক্ষাভবন ও ১টি হাউস নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ১টি ১০তলা ভবন নির্মাণের প্রকল্পও বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিদ্যমান পুরোনো টিচার্স কোয়ার্টারগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে।

❖ কলেজ কেন্দ্রীয় মসজিদের ভেতরে ও বাইরে রংকরণসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হয়েছে। মুসল্লিদের সুবিধার জন্য মসজিদের ফ্লোর-ম্যাটের ওপরে পর্যাপ্ত সংখ্যক জায়নামাযের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে মুসল্লিদের রক্ষার জন্য ক্রয় করা হয়েছে ৪টি সুবৃহৎ স্ট্যান্ড ফ্যান।

শিক্ষা-সহায়ক উন্নয়ন

সুশিক্ষার আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলাই এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি বিগত দেড় বছরে এ কলেজে শিক্ষা-সহায়ক উন্নয়নও হয়েছে উল্লেখযোগ্য।

❖ হাউসের আবাসিক ছাত্রদের ব্যক্তিগত লেখাপড়ার সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। সকালে, বিকেলে এবং রাতে ছাত্ররা যেন বেশি সময় ধরে লেখাপড়া করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারে সেজন্য লেখাপড়ার বর্ধিত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে।

❖ পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্ররা বৃত্তি পরীক্ষায় এবং দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যাতে প্রত্যাশিত ফলাফল করতে পারে সে জন্য তাদের প্রস্তুতির সুবিধার্থে সুপরিকল্পিতভাবে সাজেশন ও নোট প্রদান এবং প্রস্তুতিমূলক অতিরিক্ত ক্লাস ও মডেল টেস্ট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে পঞ্চম, অষ্টম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

❖ পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি এবং দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে তাদের ক্লাস ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় সাধনের জন্য TIC এবং সমন্বয়কারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

❖ ছাত্রদের সময়মত ও যথাযথ ইউনিফর্মে শ্রেণীকক্ষে আগমন, পাঠগ্রহণ, প্রস্থান এবং শিক্ষাভবনের সার্বিক শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা তদারকির জন্য শিক্ষাভবন দুটিতে প্রাত্যহিক ডিউটি টিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া অপেক্ষাকৃত সিনিয়র টিচারদের মাধ্যমে নবীন ও জুনিয়র টিচারদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

❖ ছাত্রদের প্রতিদিনের পিরিয়ডভিত্তিক শ্রেণীপাঠ গ্রহণ এবং শ্রেণীর কাজ, বাড়ির কাজ, পরীক্ষার রুটিন, ফলাফল ও আচার-আচরণ লিখনের জন্য সুপরিকল্পিত ডায়েরি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ছাত্রদের ছবি সংবলিত উন্নতমানের ID কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

❖ শিক্ষকদের শিক্ষণ-দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কলেজের ভেতরে ও বাইরে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন (SBA), সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি কর্মশালায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকে আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শিক্ষকদেরকে সুপরিকল্পিত ডায়েরি প্রদান করা হয়েছে।

❖ কলেজের শিক্ষকবৃন্দের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাঁদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাঁদের মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৮ শিক্ষাবর্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ সমন্বয়কারী, শ্রেষ্ঠ হাউস মাস্টার, শ্রেষ্ঠ হাউস টিউটর ও শ্রেষ্ঠ শ্রেণীশিক্ষক উপাধি প্রবর্তন করা হয়েছে।

❖ কলেজে অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্য দিবা শাখায় নবম শ্রেণীর একটি নতুন শাখা এবং প্রভাতী ও দিবা শাখায় একাদশ শ্রেণীর একটি করে নতুন শাখা চালু করা হয়েছে।

❖ 'শিক্ষা, শৃঙ্খলা, চরিত্র' এই অনন্য বাক্যবন্ধকে কলেজের 'মটো' হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষাভবন ও অডিটোরিয়াম ভবনের সম্মুখ অংশে লিখনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মটো ছাত্রদেরকে সুশিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সুশৃঙ্খল ও চরিত্রবান হতে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।

❖ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের ফলে ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অত্র কলেজের ফলাফল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে। এই ভালো ফলাফলের স্বীকৃতিস্বরূপ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা অত্র কলেজকে ২০০৮ সালের অন্যতম 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে সম্মাননা প্রদান করেছে। এছাড়াও বোর্ড অত্র প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষককে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' খেতাবে ভূষিত করেছে।

❖ অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে কলেজের অভ্যন্তরীণ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ঢাকা শহরের সেরা স্কুল ও কলেজগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক পরিসরে আয়োজন করা হয়েছে বিজ্ঞান মেলা ও কুইজ প্রতিযোগিতার।

❖ বিজ্ঞান মেলার আয়োজন উপলক্ষে কলেজে প্রথমবারের মতো প্রকাশ করা হয়েছে কালারফুল বিজ্ঞান স্যাভেনির AURORA. স্যাভেনির এ ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দের বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা ছাপানোর পাশাপাশি বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সচিত্র তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

❖ বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় কলেজের সকল ছাত্রকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিজয়ী ছাত্রদেরকে সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ছাত্ররা আগের তুলনায় বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঈর্ষণীয় সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে চলেছে।

❖ একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ 'নবীন বরণ' অনুষ্ঠান এবং দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য 'বিদায় সংবর্ধনা' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া প্রাইমারি ও জুনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জি.পি.এ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

❖ যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে জাতীয় শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এছাড়া জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপন করা হয়েছে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী নববর্ষ পহেলা বৈশাখ। এসব উৎসব-অনুষ্ঠানে কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

❖ কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি ও সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁদের পরিবার-পরিজন নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে ঈদ পুনর্মিলনী, প্রীতি সম্মিলনী, আপ্যায়ন ও বিনোদন পর্বের।

শোভাবর্ধক উন্নয়ন

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ক্যাম্পাস নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অনন্য। গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ ক্যাম্পাসকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় করার জন্য বিগত দেড় বছরে বেশ কিছু শোভাবর্ধক কাজ করা হয়েছে।

❖ কলেজ ক্যাম্পাসের সমস্ত গাছের অপ্রয়োজনীয় ও ঝুলে-পড়া ডাল কেটে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এবং আগাছা ও জঙ্গল কেটে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। ফলে গাছগুলো যেমন আগের চেয়ে নির্তার ও নয়নাভিরাম হয়ে উঠেছে তেমনি যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে পুরো ক্যাম্পাসকে এক নজরে দেখার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

❖ কলেজ মাঠের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ১০০টি নারিকেল গাছের চারা লাগানো হয়েছে। ফলে কলেজ ক্যাম্পাস হয়ে উঠেছে আরো শোভন ও দৃষ্টিনন্দন।

❖ কলেজের প্রশাসনভবন, শিক্ষাভবন ও হাউসগুলোর বাগানে ইটের বেষ্টনী-বেড তৈরি করে বাগান পুনর্বিন্যাস ও বিভিন্ন গাছ ও ফুলের চারা লাগিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

❖ টিচার্স কোয়ার্টার ও স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর সামনে ফুলের ৮টি নতুন বাগান এবং ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পরিত্যক্ত স্থানে ফলমূলের ১০টি নতুন বাগান তৈরি করা হয়েছে।

❖ কলেজের চারু ও কারুকলা বিভাগের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কলেজের পূর্ব দিকের সীমানা-দেয়ালে অপূর্ব সুন্দর শিক্ষণীয় চিত্রাঙ্কন এবং মূল্যবান বাণী লিখনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

❖ কলেজ অডিটোরিয়ামের অভ্যন্তরীণ দেয়ালগুলো দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল চিত্র দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে। কলেজের চারু ও কারুকলা বিভাগের শিক্ষকদের দ্বারা তৈরিকৃত এসব চিত্তহারী শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে মূলত বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবিই প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

প্রশাসন সংক্রান্ত উন্নয়ন

সুদক্ষ ও সুযোগ্য শিক্ষা-প্রশাসনের ওপর নির্ভর করে যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বা সাফল্য। বিগত দেড় বছরে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সুদক্ষ ও সুযোগ্য শিক্ষা-প্রশাসনের মাধ্যমে সর্বমাত্রিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রশাসন সংক্রান্ত উন্নয়নও হয়েছে উল্লেখযোগ্য।

❖ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খল করত প্রশাসনের সর্বত্র স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

❖ প্রায় ১০ কোটি টাকার নতুন এফডিআর করে কলেজের আর্থিক ভিত্তি মজবুত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

❖ উপাধ্যক্ষ ও শ্রেণীশিক্ষকবৃন্দের জন্য ভাতা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটরবৃন্দের ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

❖ অতিরিক্ত কাজের জন্য কর্মচারীদের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

❖ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য মূল বেতনের অতিরিক্ত ৩০% বিশেষ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

❖ কলেজের বৃহত্তর স্বার্থে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে প্রভাতী শাখা ও দিবা শাখার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরি একীভূতকরণ করে অভিন্ন অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে উভয় শাখার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

❖ নববিন্যস্ত অর্গানোগ্রাম অনুসারে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, সহকারী শিক্ষকসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য মোট ৫৬ টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া ব্লক পদগুলোর শিক্ষকবৃন্দকে পরবর্তী পদে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সহকারী শিক্ষক ও প্রদর্শকবৃন্দের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিগত দেড় বছরে বর্তমান অধ্যক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা ও যথাযথ দিকনির্দেশনায় কলেজের সর্বত্র অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য ও কর্মমুখরতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই পরিবেশ কলেজের সার্বিক উন্নয়নের ধারাকে বেগবান করেছে। সুদক্ষ প্রশাসনিক দিকনির্দেশনা, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস এর কার্যকর পদক্ষেপ ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদের এ প্রিয় প্রতিষ্ঠান তার উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখবে- এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সভাপতির

বাণী

যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী কচিকাঁচা শিক্ষার্থীদের অবুঝ মনের সবুজ আল্পনা চিত্রিত করার প্রধান মাধ্যম। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বার্ষিকী সন্দীপন তার চিরায়ত ঐতিহ্য নিয়ে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আবেগ ও আকুলতাকে ধারণ করে প্রকাশিতব্য বার্ষিকী সন্দীপন এর আত্মপ্রকাশকে আমি স্বাগত জানাই। সন্দীপন এর দীপশিখাগুলোই একদিন আলোকিত মানুষ হয়ে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে, আলোর মশাল হাতে পথ দেখাবে জাতিকে – এ আমার একান্ত বিশ্বাস। তাদের যাত্রাপথে আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ রইল।

পরিশেষে কলেজের অধ্যক্ষ এবং বার্ষিকী প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

মোঃ মোমতাজুল ইসলাম

শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

সাবেরা সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক,ইংরেজি বিভাগ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলের আদলে ঢাকার শেরে বাংলা নগরের পাশে ৫০ একর জমির উপর ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল (পরবর্তীতে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ) প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠাকালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত হলেও ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত করে। ১৯৬৫ সালে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করে এবং প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস এর হাতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনভার অর্পণ করে। ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠানটির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং এর স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা বহাল রাখে। এ সময় এ বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে শিক্ষা সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটি নতুন বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করা হয়। অদ্যাবধি উক্ত বোর্ড অব গভর্নরসই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির আওতায় ১৯৯৩ সালে এ প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শিফট খোলা হয়। বর্তমানে উভয় শিফটে তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর প্রায় ৪০০০ জন ছাত্র আবাসিক/অনাবাসিক হিসেবে অধ্যয়ন করছে। শিক্ষার্থীদেরকে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গঠন করা এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সমস্ত শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমান অধ্যক্ষ কর্নেল মোঃ কামরুজ্জামান খান বিগত ২৮ মে ২০০৭ তারিখে এ কলেজের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে বিশেষ গতি ও প্রাণের সঞ্চার করেন। ফলে মাত্র দেড় বছরে শিক্ষা ও সহশিক্ষার ক্ষেত্রে এ কলেজের অভাবনীয় উন্নতি ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নিচে বিগত দেড় বছরের শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হলো :

শিক্ষা

বর্তমান অধ্যক্ষ কর্নেল মোঃ কামরুজ্জামান খান কলেজের শিক্ষাক্ষেত্রে উলেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন করেন। তাঁর গৃহীত একাডেমিক কার্যক্রম, ছাত্রদের পাঠোন্নতির নিয়মিত মনিটরিং, প্রাইমারি ও জুনিয়র বৃত্তি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিশেষ কোচিং চালুকরণ, সাজেশন ও নোট প্রদান, একাধিক মডেল টেস্ট গ্রহণ, ছাত্রদের নিয়ম-শৃঙ্খলার উন্নয়ন সাধন প্রভৃতির ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে ২০০৮ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে। বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এ বছরের ফলাফলের অগ্রগতি বিস্ময়কর।

২০০৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৩১৩ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করেছে। পাশের হার শতকরা একশত ভাগ। মোট জি.পি.এ-৫ পেয়েছে ২৭১ জন। শতভাগ পাশ এবং পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী জি.পি.এ-৫ প্রাপ্তির শতকরা হারের ভিত্তিতে ঢাকা বোর্ডের সেরা দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের স্থান দ্বিতীয়। শতভাগ পাশ বিবেচনায় না নিলেও শুধু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী জি.পি.এ-৫ প্রাপ্তির শতকরা হারের ভিত্তিতে ঢাকা বোর্ডের সেরা দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের স্থান তৃতীয়। ২০০৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৪৩৬ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করেছে। পাশের হার শতকরা ৯৯.৫৪ ভাগ। মোট জি.পি.এ-৫ পেয়েছে ২৩২ জন। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী জি.পি.এ-৫ প্রাপ্তির শতকরা হারের ভিত্তিতে ঢাকা বোর্ডের সেরা দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের স্থান তৃতীয়।

এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

মাধ্যমিক পরীক্ষা- ২০০৮

বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাশের সংখ্যা	পাশের হার	জি.পি.এ- ৫	মন্তব্য
বিজ্ঞান	২৩৬	২৩৬	১০০%	২২৬	
মানবিক	২৩	২৩	১০০%	১৩	
ব্যবসায় শিক্ষা	৫৪	৫৪	১০০%	৩২	
মোট =	৩১৩	৩১৩	১০০%	২৭১	

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা- ২০০৮

বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাশের সংখ্যা	পাশের হার	জি.পি.এ- ৫	মন্তব্য
বিজ্ঞান	৩০৩	৩০২	৯৯.৬৭%	২২২	মানোন্নয়ন পরীক্ষায় ০১ জন ছাত্র অকৃতকার্য
ব্যবসায় শিক্ষা	৭২	৭২	১০০%	০৪	
মানবিক	৬১	৬০	৯৮.৩৬%	০৬	অসুস্থতার কারণে ০১ জন ছাত্র অকৃতকার্য
মোট =	৪৩৬	৪৩৪	৯৯.৫৪%	২৩২	

সহশিক্ষা

ছাত্রদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে এ কলেজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বহিরঙ্গণ সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম। ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে এ কলেজে নিয়মিতভাবে শিক্ষাসফর, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের দৈনন্দিন সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ছাড়াও এ কলেজের ছাত্ররা বিভিন্ন ধরনের বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কুইজ, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, কবিতা আবৃত্তি, প্রবন্ধ লিখন, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, গল্পবলা, হামদ-নাত, বিজ্ঞান প্রজেক্ট উপস্থাপনা, ম্যাথ-ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াড, ভাষা-প্রতিযোগ, খেলাধুলা ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় ছাত্ররা সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে চলেছে। এগুলোর মধ্যে বিগত দেড় বছরে (০১ জুন ২০০৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত) অনুষ্ঠিত বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্রদের কয়েকটি উলেখযোগ্য কৃতিত্ব উল্লেখ করা হলো :

❖ Debate for Democracy ও শহীদ লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এবং বি এস বি Cambrian ও Concord Group এর যৌথ অর্থায়নে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকার ১৬ টি সেরা কলেজের মধ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। অত্র কলেজ দল প্রথম পর্বে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজকে, কোয়ার্টার ফাইনালে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি কলেজকে, সেমিফাইনালে এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজকে এবং ফাইনালে সেন্ট যোসেফ কলেজকে পরাজিত করে। বিতার্কিকরা হলো-

ক্রমিক নং	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
১।	সৌরভ কুমার হালদার	দ্বাদশ	প্রথম বক্তা
২।	বাশিরুল আযম বিশ্বাস	দ্বাদশ	দ্বিতীয় বক্তা
৩।	মোঃ ফজলে রাব্বী	দ্বাদশ	দলনেতা

❖ এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। বিজয়ী ছাত্ররা হলো-

বিষয়	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
কুইজ	মোঃ মাহবুবুল ইসলাম	অষ্টম	দ্বিতীয়
	রুদ্র দেওয়ান	অষ্টম	
	খন্দকার মাহফুজ সালেকিন	অষ্টম	
রবীন্দ্র-সঙ্গীত	আহসান জুলকার নাঈন	দশম	তৃতীয়
নজরুল-সঙ্গীত	আহসান জুলকার নাঈন	দশম	তৃতীয়
চিত্রাঙ্কন	আসিম ফাইয়াজ	ষষ্ঠ	বিশেষ
	মোঃ মেহেদী হাসান	নবম	

❖ ATN বাংলা আয়োজিত 'যুক্তিকথন' বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বিতার্কিক দল ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজকে হারিয়ে দ্বিতীয় পর্বে উন্নীত হয়। বিতার্কিকরা হলো-

বিষয়	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
যুক্তিকথন	সৌরভ কুমার হালদার	দ্বাদশ	প্রথম বক্তা
	নাবিদ মোস্তফা জিসান	দ্বাদশ	দ্বিতীয় বক্তা
	মোঃ ফজলে রাব্বী	দ্বাদশ	দলনেতা
	তারেক রহমান	দ্বাদশ	অতিরিক্ত বক্তা

❖ জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা-২০০৮ এর থানা ও জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিজয়ী ছাত্ররা হলো-

ক-বিভাগ

বিষয়ের নাম	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
আবৃত্তি	তাহজিদ তাসনিফ রিহাত	চতুর্থ	প্রথম
	মোঃ ফারহান ইসরাক	পঞ্চম	দ্বিতীয়
উপস্থিত বক্তৃতা	ইকরামুল কবির	সপ্তম	প্রথম
ক্বেরাত	তাহজিদ তাসনিফ রিহাত	চতুর্থ	প্রথম
চিত্রাঙ্কন	শাওন চৌধুরী	চতুর্থ	প্রথম
দাবা	আসাদুজ্জামান	সপ্তম	প্রথম
	সেলিম সরকার	সপ্তম	তৃতীয়
১০০ মিটার দৌড়	মোঃ খালিদ হাসান	পঞ্চম	প্রথম
	রাকিবুল ইসলাম	সপ্তম	দ্বিতীয়
উচ্চ লম্ফ	মোঃ খালিদ হাসান	পঞ্চম	প্রথম
	সাইদ বিন রায়হান	সপ্তম	দ্বিতীয়
	সেলিম সরকার	সপ্তম	তৃতীয়
দীর্ঘ লম্ফ	রাকিবুল ইসলাম	সপ্তম	প্রথম
	মোঃ খালিদ হাসান	পঞ্চম	দ্বিতীয়
	মোশারফ হোসেন	সপ্তম	তৃতীয়

খ-বিভাগ

বিষয়ের নাম	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
হামদ ও নাত	আদনান মেহেদী খান	নবম	দ্বিতীয়
উপস্থিত বক্তৃতা	মিজানুর রশিদ	নবম	প্রথম
গল্প বলা	মিজানুর রশিদ	নবম	দ্বিতীয়
উপস্থিত রচনা	জুনায়েদ কিবরীয়া	দশম	প্রথম
	মাহমুদুল হাসান	দশম	দ্বিতীয়
	আদনান মেহেদী খান	নবম	প্রথম
	রাকিবুল হাসান	নবম	প্রথম
	মেহেদী হাসান	নবম	দ্বিতীয়
	সাব্বির হোসেন	সপ্তম	তৃতীয়

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত 'তরুণ বিজ্ঞানীদের খোঁজে- বিসিএসআইআর বিজ্ঞানমেলা- ২০০৮' প্রতিযোগিতায় সারা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ কলেজের ছাত্ররা ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে। বিজয়ী ছাত্ররা হলো-

বিষয় # প্রজেক্ট প্রদর্শনী

প্রজেক্টের নাম	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
গোবর থেকে রিচার্জেবল ব্যাটারী	মোঃ শাহরিয়ার রহমান নাফ এ রাসুল	সপ্তম সপ্তম	প্রথম
স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের সিমেন্ট	নাজিম উদ্দিন আবু সাঈদ জগৎ জ্যোতি	সপ্তম সপ্তম সপ্তম	প্রথম

বিষয় # কুইজ প্রতিযোগিতা

গ্রুপের নাম	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
নিম্ন মাধ্যমিক গ্রুপ	মোঃ জাফরুল্লাহ হেল মনসুর মোঃ মাহফুজুল হক মোঃ অমিত হাসান	অষ্টম অষ্টম অষ্টম	চ্যাম্পিয়ন
মাধ্যমিক গ্রুপ	আব্দুলাহ ইনাম তালহা মাহমুদুল হাসান পরাগ রুদ্র দেওয়ান	দশম দশম নবম	চ্যাম্পিয়ন
উচ্চ মাধ্যমিক গ্রুপ	দীপেশ দেওয়ান সোহেল এম আফনান কামরুল হোসেন শুভ	দ্বাদশ দ্বাদশ দ্বাদশ	চ্যাম্পিয়ন

বিষয় : বিজ্ঞানভিত্তিক উপস্থিত বক্তৃতা

গ্রুপের নাম	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
নিম্নমাধ্যমিক গ্রুপ	ইকরামুল কবির	সপ্তম	প্রথম
	মোঃ নেওয়াজুল হাসান	অষ্টম	দ্বিতীয়
মাধ্যমিক গ্রুপ	আসিফ বিন রশিদ	নবম	প্রথম
	মাহবুবুল হক	নবম	তৃতীয়
উচ্চ মাধ্যমিক গ্রুপ	দীপেশ দেওয়ান	দ্বাদশ	দ্বিতীয়
	শুভজিৎ ভৌমিক	দ্বাদশ	তৃতীয়

❖ Cambrian College এ অনুষ্ঠিত 2nd National Annual Quality Convention on Eudcation প্রোগ্রামে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। বিজয়ী ছাত্ররা হলো-

বিষয়	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	
কুইজ প্রতিযোগিতা	তানভীর রহমান	নবম	চ্যাম্পিয়ন
	মোঃ মাহবুবুল ইসলাম	নবম	
	নেওয়াজ শরীফ	অষ্টম	
	আব্দুল্লাহ ইনাম তালহা	দশম	
	মোঃ জাফরুল্লাহ হেল মনসুর	অষ্টম	
নাটক প্রতিযোগিতা	নির্বাচিত ১৬ জন ছাত্র		দলগতভাবে তৃতীয়

❖ সেন্ট যোসেফ আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা-২০০৮ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। বিজয়ী ছাত্ররা হলো-

বিষয়	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
কুইজ প্রতিযোগিতা	দীপেশ দেওয়ান	দ্বাদশ	রানার আপ
	কামরুল হাসান শুভ	দ্বাদশ	
	সোয়েল এম আফনান	দ্বাদশ	

❖ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা-২০০৮ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। বিজয়ী ছাত্ররা হলো-

বিষয়	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
প্রজেক্ট ডিসপ্লে	আল আমীন আকন্দ	দশম	দ্বিতীয়
	খান রেদওয়ানুর রহমান	দশম	
	সায়েম তামজিদ	দশম	
কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াড	মোঃ জাকারিয়া পারভেজ	দশম	দ্বিতীয়
কুইজ : মাধ্যমিক গ্রুপ	মাহমুদুল হাসান	দশম	রানার আপ
	সুবেন কুমার সাহা	দশম	
কুইজ : উচ্চ মাধ্যমিক গ্রুপ	দীপেশ দেওয়ান	দ্বাদশ	চ্যাম্পিয়ন
	কামরুল হাসান শুভ	দ্বাদশ	
	সোয়েল এম আফনান	দ্বাদশ	

❖ বিটিভি আয়োজিত জাতীয় স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০০৮ এর প্রথম রাউন্ডে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বিতার্কিকরা হলো-

বিষয়	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
বিতর্ক প্রতিযোগিতা	চৌধুরী মোঃ শাইয়ান মোঃ মাহবুবুল ইসলাম তানভীর রহমান	নবম নবম নবম	প্রথম

❖ এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ আয়োজিত সাংস্কৃতিক সপ্তাহ- ২০০৮ এ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। বিজয়ী ছাত্ররা হলো-

বিষয়	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
রচনা প্রতিযোগিতা	মোঃ নাঈর নাসিম	দশম	প্রথম
চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	মোঃ মেহেদী হাসান	নবম	তৃতীয়

❖ Uniaid সীড trust কর্তৃক আয়োজিত ২৭ আগস্ট ২০০৮ তারিখে উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ঢাকার ২৭টি স্কুলের মধ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের নবম শ্রেণীর ছাত্র তানভীর রহমান প্রথম হবার গৌরব লাভ করেছে।

❖ বাংলাদেশ টেলিভিশন আয়োজিত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত 'কুইজ কুইজ' প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা রাইফেলস পাবলিক স্কুল দলকে ২১০ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রথম হবার গৌরব অর্জন করেছে। বিজয়ী ছাত্ররা হলো-

বিষয়	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
কুইজ কুইজ	দীপেশ দেওয়ান	দ্বাদশ	প্রথম
	মাহদী আল মাসউদ	একাদশ	

❖ ঢাকা ইমপেরিয়াল কলেজ এর দ্বাদশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ২২ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বারোয়ারী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের একজন ছাত্র চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব লাভ করেছে। বিজয়ী ছাত্র হলো-

বিষয়	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
বারোয়ারী বিতর্ক	তানভীর রহমান	নবম	চ্যাম্পিয়ন

❖ হলিক্রস কলেজ কর্তৃক আয়োজিত ৬ষ্ঠ আন্তঃকলেজ বিজ্ঞান মেলা-২০০৮ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা উলেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিজয়ী ছাত্ররা হলো-

বিষয়	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
প্রজেক্ট ডিসপ্লে	তানভীর আহমেদ শাফকাত রহমান সুমিত গৌরব	একাদশ একাদশ একাদশ	প্রথম
ম্যাথ অলিম্পিয়াড	তাহমিদ ইয়াসার	একাদশ	দ্বিতীয়
কুইজ	দীপেশ দেওয়ান কামরুল হোসেন শুভ	দ্বাদশ দ্বাদশ	চ্যাম্পিয়ন

❖ বাংলাদেশ টেলিভিশন আয়োজিত ১০ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কুইজ কুইজ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা স্কলাস্টিকা স্কুল দলকে ১২০ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করেছে। বিজয়ী ছাত্ররা হলো-

বিষয়	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
কুইজ কুইজ	দীপেশ দেওয়ান	দ্বাদশ	প্রথম
	মাহদী আল মাসউদ	একাদশ	

Stamford University কর্তৃক আয়োজিত ১৩ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত 3rd Ittefaq Stamford National Debate Championship-2008 প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব লাভ করেছে । এছাড়া এ কলেজের ছাত্র ওয়ালী উল্লাহ বাশার চূড়ান্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং সমগ্র বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক হবার গৌরব অর্জন করেছে। বিজয়ী ছাত্ররা হলো-

বিষয়	ছাত্রের নাম	শ্রেণী	স্থান
বিতর্ক	ওয়ালী উল্লাহ বাশার তানভীর আহমেদ নাহিদ ইসলাম	একাদশ একাদশ একাদশ	চ্যাম্পিয়ন
স্কুল বারোয়ারী বিতর্ক	তানভীর রহমান	নবম	চ্যাম্পিয়ন
কলেজ বারোয়ারী বিতর্ক	ওয়ালী উল্লাহ বাশার	একাদশ	দ্বিতীয়

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা যেমন বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, তেমনি তারাও নিজেদের কলেজে এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অনুষ্ঠিত হয় 'আন্তঃস্কুল ও কলেজ বিজ্ঞান মেলা- ২০০৮'। ঢাকার সেরা ২২টি স্কুল ও কলেজের অংশগ্রহণে তিনদিনব্যাপী এ বিজ্ঞান মেলায় তিনটি অলিম্পিয়াড (ম্যাথ অলিম্পিয়াড, কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াড, অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্স অলিম্পিয়াড) সহ বিজ্ঞানভিত্তিক উপস্থিত বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং প্রজেক্ট প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ বিকাল ৩-৩০ ঘটিকায় কলেজ বটমূল প্রাঙ্গণে এ বিজ্ঞান মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস এর মাননীয় চেয়ারম্যান ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিব জনাব মোঃ মোমতাজুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান।

হাউস প্রতিবেদন

কুদরত-ই-খুদা হাউস

হাউস মাস্টার : সাবেরা সুলতানা
হাউস টিউটর : এম এম ফজলুর রহমান
হাউস এল্ডার : মোঃ নেওয়াজ শরীফ
হাউস প্রিফেক্ট : আবিদ হাসান

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ যে ৬টি আবাসিক ছাত্রাবাস নিয়ে তার গৌরবোজ্জ্বল যাত্রাকে স্বমহিমায় ভাস্বর রেখেছে কুদরত-ই-খুদা হাউস তাদের মধ্যে অন্যতম। এদেশের খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নামে হাউসটির নামকরণ করা হয়েছে "কুদরত-ই-খুদা হাউস"।

কুদরত-ই-খুদা হাউসের অবকাঠামো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও মনোরম। ছোট-বড় মোট ১৩টি ছাত্রকক্ষ বিশিষ্ট এ দ্বিতল হাউসটিতে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর মোট ১৯০ জন ছাত্রের আবাসনের সুব্যবস্থা রয়েছে। হাউসের অভ্যন্তরে রয়েছে ১টি বর্গাকৃতির অপরূপ মোহনীয় বাগান। হাউসের সাথেই রয়েছে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর এর বাসগৃহ। এছাড়াও হাউস পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন ১ জন মেট্রন, ২ জন বাবুর্চি, ১ জন ম্যাট, ২ জন ওয়ার্ডবয়, ২জন টেবিলবয়, ১ জন দারোয়ান, ১জন মালি ও ১ জন সুইপার।

হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতায় হাউসের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ভোরবেলার পিটি থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত হাউসের প্রতিটি কাজই সম্পন্ন হয় নিয়ম-রুটিন মাফিক। এ হাউসের ছাত্রদের লেখাপড়া, সংস্কৃতিচর্চা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা গৌরবময়। ছাত্রদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার উদ্দেশ্যে হাউসে রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। প্রতিটি পদের জন্য রয়েছে একজন করে প্রিফেক্ট। তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকে তাদের সতীর্থ সহপাঠী ও অনুজ-প্রতিম ছোটদের উদ্দেশ্যে সহযোগিতার হাত বাড়াতে।

এ বছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কুদরত-ই-খুদা হাউসের সাফল্য অতুলনীয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তুমুল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সাত বছর পর কুদরত-ই-খুদা হাউস চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। আন্তঃহাউস ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইনডোর গেমস এ কুদরত-ই-খুদা হাউস নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। এছাড়া আন্তঃহাউস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় এ হাউসের খেলোয়াড়রা ৫০ পয়েন্টের ব্যবধানে বিজয়ের গৌরব লাভ করে। ২০০৮ সালের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে এ হাউস রানার আপ হয়।

আন্তঃহাউস মঞ্চ প্রতিযোগিতায়ও কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্ররা সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে চলেছে। বাংলা বানান প্রতিযোগিতায় এ হাউসের ক্ষুদে বানান বিশারদরা তিনগুণ বেশি পয়েন্টের ব্যবধানে বিজয়ী হয়। এছাড়া বিসিএসআইআর কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা-২০০৮ এ সারা বাংলাদেশের স্বনামধন্য স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরাজিত করে এ হাউসের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে গঠিত দু'টি দল যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

কুদরত-ই-খুদা হাউসের উল্লিখিত কৃতিত্ব ও গৌরব অর্জন মূলত এ হাউসের সাথে সংশিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফল। হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অক্ষুণ্ন থাকুক এটাই প্রত্যাশা।

জয়নুল আবেদীন হাউস

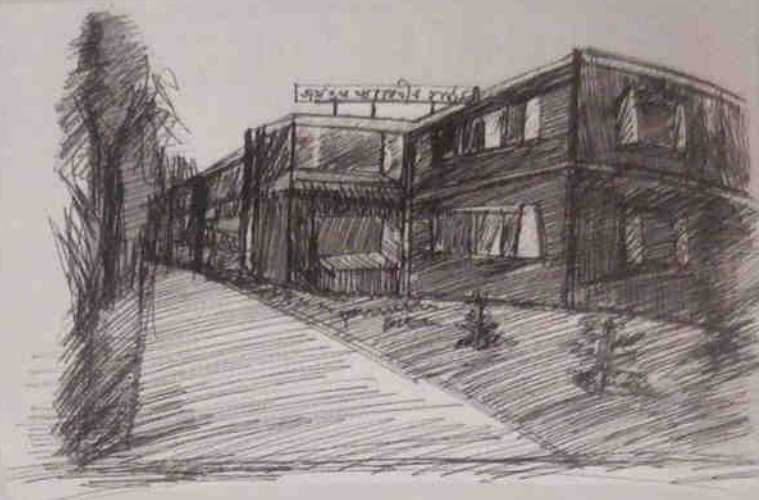

হাউস মাস্টার : মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
হাউস টিউটর : নাসরীন বানু
হাউস এন্ডার : আমিনুল ইসলাম
হাউস প্রিফেক্ট : তানভীর মঞ্জুর

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের আবাসিক ছাত্রদের বসবাসের জন্য যে ৬টি ছাত্রাবাস রয়েছে, সেগুলোর ১টি জয়নুল আবেদীন হাউস । ১৯৬১ সালের ০১ মে এ ছাত্রাবাসের জন্ম। স্বাধীনতা পূর্বকালে এ হাউসের নাম ছিল 'আইয়ুব হাউস'। স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রথম এর নামকরণ করা হয় 'দুই নম্বর হাউস'। পরবর্তীকালে মরহুম অধ্যক্ষ লুৎফুল হায়দার চৌধুরীর সময় এর নাম হয় 'জয়নুল আবেদীন হাউস'। দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব শিল্পাচার্যের নামে নামকরণ করা হয়েছে বলে হাউসের সাথে সংশিষ্ট সকল ছাত্র- শিক্ষক গর্বিত।

বর্তমানে প্রায় ১৫০ জন ছাত্র হাউসটিতে অবস্থান করছে। গোলাপসৌরভ, পলাশকানন, কৃষ্ণচূড়ামেলা, শৈলবিশাল ভাস্কর দিগন্ত, শিমুলসাথী, দ্যুলোকনীল, কাশবন, পদ্মপরশ, সৃজন, মনন এবং সারথী নামের ১২টি বিশেষ কক্ষ ছাড়াও প্রেয়াররুম, কমনরুম এবং ডাইনিং হল তো রয়েছেই। ছাত্রদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনার জন্য হাউস মাস্টার এবং হাউস টিউটর এর আবাসস্থল রয়েছে হাউসের সাথে। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং একই সাথে ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে রয়েছে ১টি 'প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড'। প্রতিটি পদের জন্য রয়েছে ১জন করে প্রিফেক্ট। তারা তাদের সহযোগিতার হাত সর্বদাই বাড়িয়ে রাখে সতীর্থ ও অনুজপ্রতিম ছাত্রদের উদ্দেশে।

গত কয়েক বছর সকল ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদীন হাউসের ছাত্রদের সাফল্য ছিল আকর্ষণীয় ও ঈর্ষণীয়। জয়নুল আবেদীন হাউসের ছাত্ররা বরাবরই ভাল ফলাফল অর্জন করেছে। এ হাউসের ৮ম শ্রেণীর আবুল ফজল মোঃ চিশতী, রকিবুল হাসান, মাহবুবুল ইসলাম, আবীর হাসান জুনিয়র বৃত্তি এবং পঞ্চম শ্রেণীর সৈয়দ মোঃ সামীন ইয়াসার, আল ইমরান অপু, আতিকুর রহমান, রাফি খন্দকার, নাহিয়ান আক্তার প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করার গৌরব অর্জন করেছে।

খেলাধুলায় জয়নুল আবেদীন হাউস ২০০৮ সালে সেরা সফলতা অর্জন করেছে। গত কয়েক বছর আন্তঃহাউস ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়াও ফুটবল ও ভলিবল প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়। এ বছরও আন্তঃহাউজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে রানার আপ এবং সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০০৮ এ চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়া দেয়াল পত্রিকা ও মঞ্চ নাটকে এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

জয়নুল আবেদীন হাউসের এ সাফল্য ও গৌরব কারও একক প্রচেষ্টায় অর্জিত হয় নি। সামগ্রিকভাবে হাউসের সকল ছাত্র, সকল শ্রেণীর কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা ও সহযোগিতা এ হাউসের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়তা করেছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এ হাউসের সকলের আত্মিক বন্ধন হোক সুদৃঢ়, অবস্থান হোক সুখের এবং নিত্যদিনের কর্ম হয়ে উঠুক আরও গতিময়।

ফজলুল হক হাউজ

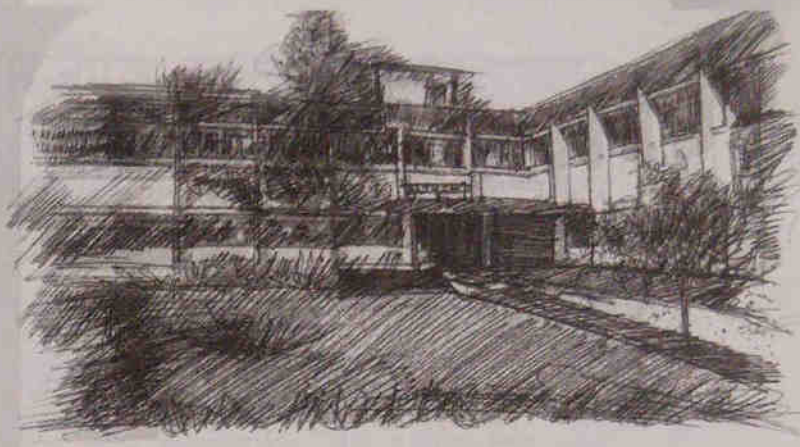

হাউস মাস্টার : মোঃ মেসবাউল হক
হাউস টিউটর : মোঃ জাহেদুল হক
হাউস এল্ডার : দীপেশ দেওয়ান
হাউস প্রিফেক্ট : ইশতিয়াক আহমেদ

"উৎকর্ষ সাধনে অদম্য"- এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের অন্যতম ফজলুল হক হাউস। দেশমাতৃকার অমর সন্তান কৃষকবন্ধু শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এই হাউসের ছাত্রদের প্রতিটি কাজে তাঁর দেশপ্রেম ও সুমহান আদর্শের অনিন্দ্য প্রকাশ ঘটে। এ হাউসের গাঢ় সবুজ রঙের পতাকায় যেন রূপসী বাংলার শ্যামল প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠে। শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও ঐতিহ্যের প্রতিভূ ফজলুল হক হাউস। বর্তমানে প্রায় ১১২ জন ছাত্র হাউসটিতে অবস্থান করছে। হাউসে রয়েছে ছোট-বড় সাতাশটি রুম, রয়েছে কমনরুম ও সুবিশাল ডাইনিং রুম। হাউসের ছাত্রদের দেখাশুনার জন্য একজন হাউস মাস্টার, একজন হাউস টিউটর, একজন স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালী ও বাবুর্চিসহ অন্যান্য কর্মচারী রয়েছেন। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এই হাউসের শান্ত, স্নিগ্ধ ও মনোরম পরিবেশ প্রতিটি ছাত্রের কাছে এনে দিয়েছে পড়াশুনার সর্বোত্তম সুযোগ। সহপাঠ্য কার্যক্রমেও হাউসের ছাত্ররা কলেজ ও হাউসের কাছে তাদের প্রতিভার উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

বরাবরের মতো এ হাউস ২০০৪ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং সর্বশেষ ২০০৮ সালে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০০৮ সালের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় শতদল গ্রুপের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দীপেশ দেওয়ান এ হাউসের ছাত্র। তাছাড়া ২০০৭ ও ২০০৮ সালে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানারআপ হয়। আবার ২০০৩ সাল থেকে ২০০৬ সালে এ হাউস আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০০৭ সালে আন্তঃহাউস ইনডোর গেমসে এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া আন্তঃ হাউস বাগান প্রতিযোগিতায় ২০০৭ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করে। শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় এ হাউসের ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। হাউসের হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর ও প্রতিটি কর্মচারীর সাথে ছাত্রদের সম্পর্ক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতাপূর্ণ। বন্ধুত্ব ও মায়া-মমতার এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ এ হাউসের সবাই। দেশপ্রেম ও সত্যের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সকল বাধাকে চূর্ণ করে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাব অভীষ্ট লক্ষ্যে- এই মূলমন্ত্রই এ হাউসের সকলের অন্তরে প্রোথিত। হাউসের প্রতিটি ছাত্রের কণ্ঠে অনুরণিত হয় এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-

" কর্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে করে যাব দান
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে তোমার আহবান।"

নজরুল ইসলাম হাউস

হাউস মাস্টার : মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক
হাউস টিউটর : মোঃ ছানাউল হক
হাউস এল্ডার : ফরিদ উদ্দিন আহমেদ
হাউস প্রিফেক্ট : এ বি এম তানভীর পাশা

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটিতে আবাসিক ছাত্রদের জন্য রয়েছে ছয়টি হাউস। এসব হাউসের মধ্যে 'নজরুল ইসলাম হাউস' অন্যতম। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয় 'নজরুল ইসলাম হাউস'।

নজরুল ইসলাম হাউসের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর ছাড়াও আছেন স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালি ও বাবুর্চিসহ মোট ১০ জন কর্মচারী। হাউসের ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সুনিবিড় হৃদ্যতায় আবদ্ধ। নিসর্গমণ্ডিত এ হাউসের ছাত্ররা শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের উজ্জ্বলতম আদর্শ।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্রদের কৃতিত্ব ঈর্ষণীয়। এ হাউসের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ শ্রেণীর মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। সহশিক্ষামূলক নানাবিধ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ছাত্ররা নিজেদের লেখাপড়ার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে বলে তাদের ফলাফল বরাবরই ভালো হয়। বর্তমান অধ্যক্ষ কর্নেল মোঃ কামরুজ্জামান খান এর যথাযথ দিক নির্দেশনায় এবং হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি এ হাউসের ছাত্ররা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও ক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। ২০০৭ সালে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নজরুল ইসলাম হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া আন্তঃহাউস ফুটবল ও বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায়ও এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়। সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০০৭ এ আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও দলীয় অভিনয়ে প্রথম স্থান অর্জন করে। ইনডোর গেমস্ এ দাবা প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন, ভলিবল প্রতিযোগিতায় রানার আপ এবং দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এভাবে এ হাউসের ছাত্ররা নিরলস পরিশ্রম, আন্তরিকতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে চলেছে।

নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্ররা হাউসের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে নিয়মানুবর্তিতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা কখনো পরস্পরের বন্ধু বা সহযোগী আবার কখনো প্রতিযোগী। বিদ্রোহী কবির আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত এ হাউসের ছাত্ররা আকাশী নীল রঙের হাউস পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে সমস্বরে উচ্চারণ করে-

"মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম
মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়
মোরা প্রকৃতির মত সচ্ছল।"

লালন শাহ হাউস

হাউস মাস্টার : ড. মোঃ নূরুন নবী
হাউস টিউটর : প্রশান্ত চক্রবর্তী
হাউস এল্ডার : আফজাল হোসেন
হাউস প্রিফেক্ট : স্নিগ্ধ জ্যোতি আহমেদ

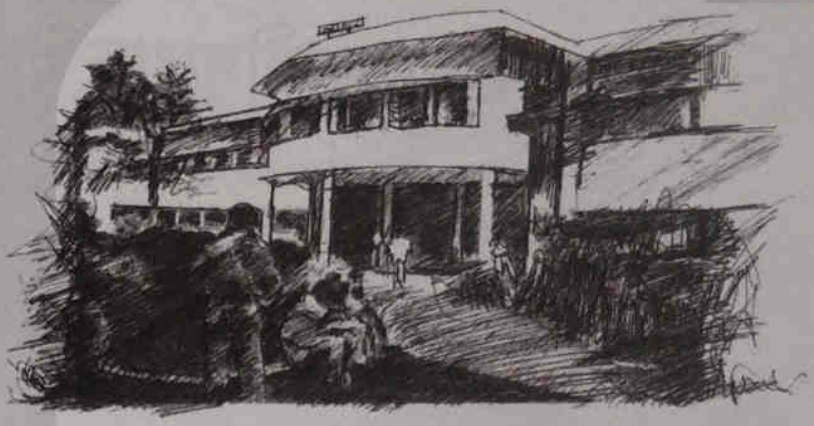

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ছয়টি সুবৃহৎ ছাত্রাবাস- যেগুলো 'হাউস' নামে পরিচিত। 'লালন শাহ্ হাউস' সেগুলোর অন্যতম। ১৯৬০ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত লালন শাহ্ হাউসের ভবনটি কলেজের মেডিকেল সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হত। ১৯৭৭ সাল থেকে তা আবাসিক ছাত্রাবাস হিসেবে তার শুভযাত্রা শুরু করে। শুরুতে এটি '৩ নম্বর হাউস' নামে পরিচিত থাকলেও ১৯৭৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ মরহুম কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ বিখ্যাত বাউল সাধক লালন শাহ্-এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করেন 'লালন শাহ্ হাউস' ।

পূর্ব ও পশ্চিমে লম্বিত ও প্রকৃতি-পরিবেষ্টিত দ্বিতল লালন শাহ্ হাউসের সুপরিসর অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। শিক্ষাভবন-১ ও অধ্যক্ষের বাসভবনের সন্নিকটে অবস্থিত এ হাউসে ছাত্রদের জন্য রয়েছে ২৯ টি কক্ষ। এসব কক্ষে ১০২ জন ছাত্রের আবাসনের সুব্যবস্থা আছে। অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষা-সহায়ক পরিবেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা নিজ গৃহের মতোই অবস্থান করে এ হাউসে। ছাত্রদের বসবাসের কক্ষ ছাড়াও এ হাউসে রয়েছে ১টি অফিসরুম, কমনরুম, ডাইনিংরুম, কিচেন, স্টোর ও স্টাফরুম। হাউসের ছাত্রদের সার্বক্ষণিক দেখাশুনা ও সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিয়োজিত আছেন ১ জন হাউস মাস্টার, ১ জন হাউস টিউটর, ১ জন স্টুয়ার্ড, ১জন ওয়ার্ডবয়, ১জন বাবুর্চি, ১ জন সহকারী বাবুর্চি, ১ জন ম্যাট, ২ জন টেবিলবয়, ১ জন মালী, ১ জন দারোয়ান ও ১ জন সুইপার। এ হাউসের প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে গভীর হৃদ্যতা, তেমনি ছাত্রদের সঙ্গে হাউসের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে আছে সুনিবিড় সম্পর্ক। সবার আন্তরিকতা ও সার্বিক সহযোগিতায় হাউসের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

লালন শাহ হাউসের ছাত্ররা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বরাবরই অগ্রগামী। 'ছাত্রানাম অধ্যয়নং তপঃ' এ সংস্কৃত শ্লোক ও 'সময় গেলে সাধন হবে না'– লালন শাহের এ আপ্তবাক্যের মর্মকথায় তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। তাই কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উলেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই এ+ ও এ গ্রেড অর্জন করে থাকে। লেখাপড়ার মাধ্যমে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য চরিত্র গঠনেও তারা সদা সচেতন ও আন্তরিক। সততা, সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সেবা, ত্যাগ, পরোপকারিতা, ধৈর্যশীলতা, ক্ষমাশীলতা, ভদ্রতা, বিনয়, উদারতা, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি গুণ অর্জনের মধ্য দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ।

লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডেও লালন শাহ্ হাউসের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। আন্তঃ হাউজ মঞ্চ প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় এ হাউসের ছাত্ররা উলেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তারা ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, ফুটবল প্রতিযোগিতায় রানার আপ, ক্যারাম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় রানার আপ, বাগান প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় এবং আযান প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং সাধারণ জ্ঞান ও ধাঁধা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। হাউসের এ সাফল্যের পেছনে কাজ করেছে ছাত্রদের যোগ্যতা, নৈপুণ্য, প্রচেষ্টা ও সর্বোপরি হাউসের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা। তাদের এ সাফল্যের ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সবাইকে নিয়ে লালন শাহ্ হাউস একটি পরিবার। এ পরিবারের সাফল্য ও সুনামের অংশীদার সবাই। তাই সবাইকে অফুরন্ত শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। 'লালন পরিবারের' প্রতিটি সদস্যের আত্মিক বন্ধন আরো সুদৃঢ় হোক, আগামী দিনগুলো হোক আরো সাফল্যের, আরো আনন্দের । মহান আলাহর কাছে এটাই প্রার্থনা।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস

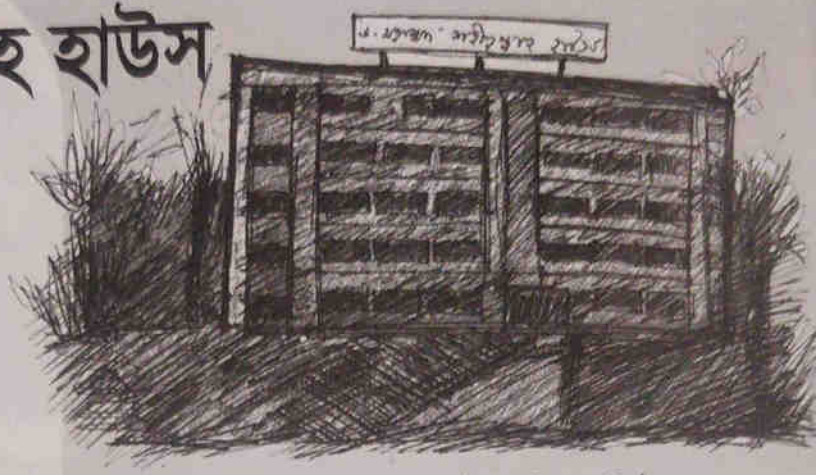

হাউস মাস্টার : মোঃ শহীদ উল্যাহ
হাউস টিউটর : মোঃ সেলিম
হাউস এল্ডার : শামীম আহসান
হাউস প্রিফেক্ট : কামরুজ্জামান শেখ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে এটি ছিল সম্পূর্ণ আবাসিক প্রতিষ্ঠান। সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির আওতায় এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৯৩ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অনাবাসিক শিফ্‌ট চালু করা হয়, যা পরবর্তীকালে দিবা শাখা নামে পরিচিতি লাভ করে। শুরু থেকেই দিবা শাখার ছাত্রদের আবাসিক চাহিদা প্রকট থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে আবাসিক সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠানে একটি নতুন হাউস নির্মাণ করা হয়। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নাম অনুসারে হাউসটির নামকরণ করেন এবং হাউসটি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের দিবা শাখার ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ কর্নেল মোঃ কামরুজ্জামান খান এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, দৃঢ় মনোবল এবং দিবা-রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গত ২০ মার্চ ২০০৮ তারিখ এ হাউসের যাত্রা শুরু হয়। হাউসটির উদ্বোধন করেন কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষের সহধর্মিণী মিসেস মাহবুবারা জামান।

শুরুতে হাউসের ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ জন। হাউসের অবকাঠামো বলতে তেমন কিছুই ছিলনা। বর্তমান অধ্যক্ষের নিরলস প্রচেষ্টায় এবং অন্যান্য হাউস কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে হাউসটি চালু করা হয়। ইতোমধ্যে এ হাউসে আবাসিক ছাত্রদের পাশাপাশি এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী মিলে ৬৫ জন পরীক্ষার্থী হাউসে অবস্থান করে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। বর্তমানে এ হাউসে ছাত্র সংখ্যা ৯৬ জন। সদ্য যাত্রা শুরু করার কারণে কলেজের সামগ্রিক সহশিক্ষা কার্যক্রমে এ হাউসের ছাত্রদের অংশগ্রহণের সুযোগ বা অবকাশ এখনও তেমন একটা হয় নি। তবে এ হাউসে অনেক মেধাবী ও সৃজনশীল শিক্ষার্থী রয়েছে। আশা করা যায় তারা ক্রমান্বয়ে পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রমে কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখবে। এ লক্ষ্যে হাউস কর্তৃপক্ষ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউসের ছাত্ররা কলেজের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে সর্বোচ্চ শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিচ্ছে। কখনো তারা সহপাঠীদের সহযোগী ও বন্ধু, কখনও প্রতিযোগী সতীর্থ। হাউসটি নবীন হলেও হাউসের ছাত্ররা ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছে। এ হাউসের ছাত্ররা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে মা, মাটি ও মানুষের প্রতি পরম ভালোবাসা ও ভক্তির অনুশীলনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

ছড়া ও কবিতা

কাক ডাকা ভোরের আগে

কর্নেল মোঃ কামরুজ্জামান খান
অধ্যক্ষ

রাতের শেষপ্রহর তারার মিটিমিটি আলো,
পূর্বাকাশে কাটেনি যেন আঁধারের কালো।
সহসা শোনায় নেড়ি কুকুরের ঘেউ-ঘেউ,
থমথমে প্রকৃতি কী ঘটবে জানে না কেউ।
পঁচিশে মার্চের দিবাগত রাতের শেষলগ্ন,
বঙ্গমাতার সন্তানেরা গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।
রাতের অন্ধকারে অতর্কিতেই দেয় হানা,
পলকে পাকসেনা জান-মাল করে ফানা।
নির্বিচারে নির্মম হত্যাযজ্ঞের অবতারণা,
রক্তবন্যায় ভেসে যায় বাংলার আঙ্গিনা।
যত্র-তত্র রয়েছে পড়ে লাশ আর লাশ,
সাক্ষী বসুমতী সান্ত্বনার নেই অবকাশ।
আবছা আঁধার শ্মশানে শিয়ালের হাঁক,
নিমেষেই আকাশে উড়ে শকুনের ঝাঁক।
বঙ্গমাতার বুকফাটা ক্রন্দন আহাজারি,
নির্মম সেই করুণ স্মৃতি ভুলিতে নারি।
সন্তানহারা জননীর কান্নার প্রতিদান,
প্রতিশোধে ভুল করেনি বীর বঙ্গসন্তান।
মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙালি করেনি খামখেয়ালি,
শত্রুসনে করেনিকো আপোস মিতালি
অকপটে নিভৃতে মুক্তিযুদ্ধে পা বাড়ায়,
মাতৃভূমির মমতায় আপনারে বিলায়।
ভোলেনি কাকডাকা ভোরের নৃশংসতা,
লক্ষ শহীদের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতা।

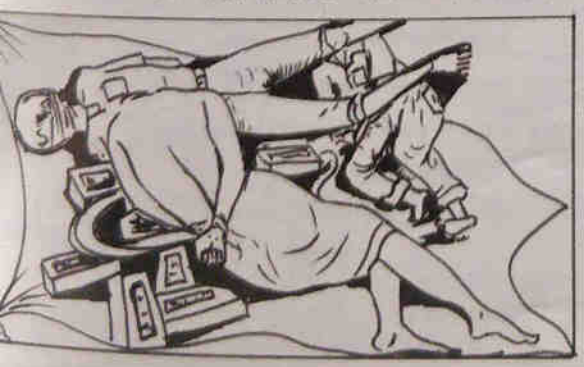

ফাল্গুনী

কর্নেল মোঃ কামরুজ্জামান খান
অধ্যক্ষ

নববধূ সেজে এসেছে ফাল্গুনী পৃথ্বী 'পরে,
বাসন্তী যেন দিয়েছে উঁকি রঙিন বাসরে।
পত্রহীন পল্লবে ফুটেছে কত নতুন কুঁড়ি,
প্রকৃতির পরিসরে যেন নবাগত কুমারী।
বহে সদা পরশ ভুলানো দক্ষিণা সমীরণ,
কোকিলের কণ্ঠে শোনায় ঐ বসন্ত বরণ।
শিমুলের শাখে লেগেছে প্রেমের আগুন,
শালিকের ঝাঁকে ডাকছে স্বাগত ফাগুন।
আম্রমুকুলের সুবাসে আবেশিত আঙিনা,
কুমারীর উতলা মন যেন মেলেছে ডানা।
কুলগাছে শোভিত কত কাঁচা-পাকা কুল,
ডানপিটে ছেলেরা হেথা হয়েছে ব্যাকুল।
বাতাসে রাখালি বাঁশীর মনোমোহিনী সুর,
বাজিছে কানে বারবার কতই না সুমধুর।
মাঠভরা ধানক্ষেতে সবুজ ঢেউয়ের খেলা,
কৃষাণ-কৃষাণীর প্রাণে দেয় খুশির দোলা।
ফুলে-ফলে, তরু-লতায় শোভিত বসুমতী,
প্রাণবন্ত কুঞ্জবনে উড়ছে রঙ্গিন প্রজাপতি।
বটতলায় গানে-কবিতায় প্রাণের উৎসব,
বসন্তের মলয়ে ছড়ায় ভালবাসার সৌরভ।
কাননে কুসুম-কলি নানা সাজের সমাহার,
প্রাণের স্পন্দনে মুখরিত অমর্ত্য অভিসার।
বিরাগ বিদ্বেষ ভুলে বসেছে ঐ মিলনমেলা,
প্রেমপ্রত্যয়ে প্রাণের উৎসবে কাটে বেলা।

আমার মা

সালেহ আব্দুলাহ (অর্ঘ্য)
কলেজ নম্বর : ১১০৯৬
শ্রেণী : তৃতীয় (প্রভাতী)

আমার দিনগুলো চলে যায়,
প্রিয়জন নাই যে দুনিয়ায়।
যে আমায় এত ভালবাসত
তাঁর কথা কি যায় রে ভোলা যায়?
তাঁর স্মৃতি আমার চোখে ভাসে
আমার দুঃখ পানি হয়ে ঝরে।
যখন আমি ভর্তি হই স্কুলে
মা মারা যায় তার দু'মাস আগে।
মা আমার মা,
তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।
আমি তোমার ছেলে মাগো
থাকি তোমার সঙ্গে,
তোমার সাথে থাকতে আমার
স্বপ্নের মত লাগে।
আমি যেন চিরদিন মনে রাখি,
মাগো তোমার স্মৃতিগুলো।

সন্ধ্যা নামে

অরিত্র রায়হান
কলেজ নম্বর : ২৭২৬
শ্রেণী : অষ্টম (দিবা)

সবুজ শ্যামল ছায়ায় ভরা
গ্রামগুলি মোর দূরে,
ভোরের শীতল কুয়াশা এসে
দেয় যে আমায় ছুঁয়ে।
স্বচ্ছ নীল কাচের মত লালদিঘিটির পানি,
রূপসী এই দেশটা আমার সকল দেশের রাণী।
ছোট বড় সকল নদী, দেখতে লাগে ভালো,
মায়া ভরা স্বপ্ন দেখায় শেষ বিকেলের আলো।
সন্ধ্যা নামে দূর সে বনে, আঁধার নেমে আসে
আকাশ ভরা লক্ষ তারা
শিশির ঝরে ঘাসে।

অরণ্যের টানে

মোঃ রাইসুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ২৭৬০
শ্রেণী : অষ্টম (দিবা)

হেঁটেছি বনের পথে
পথের ঘাসের সিক্ত শিশিরে,
রিক্ত পা দুটো ভেজাতে
হেঁটেছি বনের পথে।
পথে পথে অপরাজিতা
অপরাজেয় রূপে হয়তো গড়েছেন
আল্লাহ কিংবা দেবতা।
ওপাশের মাঠে, নির্ঝঞ্ঝাটে
ফুটে আছে কত সরষে,
বাতাসের দোলে, পড়িতেছে ঢুলে
হয়তো বা মহাকর্ষে।
শাল গাছে ভরা, বিধাতার গড়া
আসলাম মহাবনে,
এই মন যেন পুলকিত হল
দখিনা সমীরণে।

সেদিন আমি তোমার হব

তৌকির মুজিব
কলেজ নম্বর : ১০০৩২
শ্রেণী : দশম (প্রভাতী)

আমায় একটা পৃথিবী দাও
বিভেদহীন, যুদ্ধহীন, গোলাবারুদহীন,
ফুল পাখি আর মানবতাময়
আমি তোমাকে স্বপ্নে মাখা
সুখ দেবো।
আমায় একটু ভালবাসা দাও
স্বার্থপরতা, প্রতারণা আর ছলনাহীন,
আমি তোমাকে আমার অস্তিত্বের
সবটুকু সুন্দর দেব।
খুনহীন একটা খবরের কাগজ দাও
কাক ডাকা কোনো এক ভোরে,
আমি তোমাকে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল গোলাপ দেব।
তুমি আমায় একজন দেশ প্রেমিক নেতা দাও
আমি রাজপথ ছেড়ে
নিশ্চিন্তে তোমার কাছে আসব।

রান্না

জিহান আল হামাদী
কলেজ নম্বর : ১০৭৪০
শ্রেণী : দশম (প্রভাতী)

হাঁড়ির মধ্যে শুয়ে ছিল
লাল মোরগের গোস্ত,
লবণ এসে বলল এবার
কেমন আছ দোস্ত?
রাত্রিবেলা হঠাৎ করে
এলো আবার কে আজ?
চিনলে না ভাই ?
এইতো আমি
তোমার সাথী পেঁয়াজ।
বলল এসে রসুন
আপনি একটু বসুন,
এবার এলো আদা
কেমন আছেন দাদা?
মরিচ বলে, " ধুত্তুরি ছাই,
তোমার গায়ে কাদা"।
বলল্ এসে তেল
দেখব এবার খেল,
এবার এলো পানি
তারি মধ্যে খাচ্ছে সবাই
নাকানি চুবানি।

গ্রামীণ সকাল

মোঃ আশরাফুল রহমান
কলেজ নম্বর : ১০৪৪৩
শ্রেণী : একাদশ (প্রভাতী)

গাছে গাছে পাখি ডাকে,
ফুল ফোটে শাখে শাখে।
রাতের চাঁদ চলে যায়,
ভোরের আভায় মন রাঙায়।
নদীর ছল্ ছল্ কলতান,
জুড়ায় আমার মন-প্রাণ।
কৃষকেরা লাঙ্গল কাঁধে,
ফসলের স্বপ্ন বাঁধে।
মাঝিরা পাল তুলে নৌকা চালায়,
দখিনা হাওয়ায়।
কাঁখে কলসি নিয়ে যায় বধূ।
শুরু হয়- বাংলার সকাল,
শুরু হয়- নতুন দিন,
নিঃসন্দেহে শঙ্কাবিহীন।

স্বপ্নের রেশ

মোঃ সাহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া
কলেজ নম্বর : ১০৩৮৭
শ্রেণী : একাদশ (প্রভাতী)

বার বার এগোতে যায়,
হোঁচট খায়
থমকে দাঁড়ায়,
পড়ে যায় রাস্তায়।
আবার এগোতে যায়,
লাথি খায়
মারের ঘায়,
পড়ে যায় রাস্তায়।

অবিরাম হোঁচট খেতে খেতে,
রাস্তার শেষ!
উঠে দাঁড়ায়।
চমকে যায়,

ভয় নাই ভেবে এগিয়ে যায়,
নতুনের প্রত্যাশায়।
নতুনকে ছুঁতে চায়,

স্বপ্ন হা-য়!
ভাবে তাই
স্বপ্নের পথে,

আনমনে তনুতে চিমটি কেটে,
থমকে দাঁড়ায়।

ভয়! বার বার পতন কি,
চিরচেনা সেই রাস্তায়?
কিন্তু তার যে হঠাৎ হয় অঞ্জলি,
স্বপ্নের হয় শেষ।

আজ এই কঠিন বাস্তবেই
খুঁজে পায় স্বপ্নের রেশ।

স্মৃতি মাখা দিন

মোঃ শিবলী সাদিক
কলেজ নম্বর : ১১২৩৪
শ্রেণী : একাদশ (প্রভাতী)

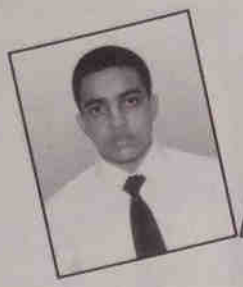

বৃষ্টি ঝরলেই পড়ে মনে
কত স্মৃতিমাখা কত কথা আনমনে।
নাড়া দিয়ে যায় আমার
স্মৃতির বীণায় সারাক্ষণ।
আড়াল হয়ে যাওয়া দিনগুলো
ভুলে যাওয়া নয়।
মেঘের ভিতর বৃষ্টি
অঝোর ধারায় বয়।
ফিরে পেতে চায় সেই ক্ষণ,
প্রহরে প্রহরে গুনি অনুক্ষণ।

জয়তু গণিত

অনাদিনাথ মণ্ডল
প্রভাষক, গণিত বিভাগ

গণিত দিয়ে বিশ্ব জয়-সম্ভব নাকি?
যদি করো অনুশীলন, না দিয়ে ফাঁকি।
মনের ভয় দূর করে, যদি হও শক্ত
তোমার কাছে নিশ্চয় গণিত হবে ভক্ত ।
মুখস্থকে ছুঁড়ে ফেলে, যুক্তির পথ খোঁজো
ইচ্ছা ও চিন্তা দিয়ে সমস্যাটা বোঝো।
শেখার বিষয় সবার আগে, শিখতে যদি পারো
যত কঠিন সমস্যা হোক ঠেকবে না একবারও
নাম্বারের জন্য না ছুটে, ভালোবেসে শেখ।

চাওয়া

বিজয় সরকার
কলেজ নম্বর : ১১৩২৫
শ্রেণী : একাদশ (প্রভাতী)

আজ এই বসন্তে নিশ্চুপ আমি,
তুমি নেই বলে,
প্রকৃতির রঙের মত
করে আজ বদলে গেছো।
এই বসন্তে তুমি
সেজেছো স্বপ্নিল রঙে,
আমি চেয়েছিলাম
এই বসন্তের রঙে রঙিন হতে।
কিন্তু আমায় ফেলে
তুমি একাই সাজলে।

মুক্তি

মোঃ শাহরিয়ার কবির
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

শুধুই অর্থের তরে নহে এ জীবন,
হে বন্ধু! খুঁজেছ কি কখনো ভিন্ন অর্থ
এ জীবনের ? দেখি শুধু নিজের স্বার্থ
পথ চলি মোরা অহোরাত্রি অনুক্ষণ,
উদ্দেশ্য কি কেবল কৃতিত্ব প্রদর্শন ?
কেন কর ব্যয় তুমি সকল সামর্থ্য
তোমার ? সার্থক হবে তুমি কিংবা ব্যর্থ
এ জীবনে ; যদি পাও অমূল্য রতন ?
ফিরে এসে মুছে ফেল হৃদয়ের স্বেদ
স্বার্থ বুদ্ধিকে কর সুদূর পরাহত।
যশ আর প্রতিপত্তি দূরে ফেলে দাও
নির্মল কর তোমার গ্লানি আর ক্লেদ।
সুসংহত হও তুমি না হও উদ্ধত
এপারে আর ওপারে যদি মুক্তি চাও।

দিশারী

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

চারিদিকে শুধু আতঙ্ক, হাহাকার ও অমানিশা
কে দেবে মডেল কলেজের মুক্তির দিশা?
কে শোনাবে মোদের কল্যাণের বারতা?
এমনি এক সন্ধিক্ষণে, এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে
আশার আলো নিয়ে উদিত হলে তুমি।
যেখানে চারিদিকে ছিল শুধু অদক্ষতা ও অনিয়মের হুঙ্কার
সেখানে নিয়ে এলে নিয়মতান্ত্রিকতা ও দক্ষতার জয়জয়কার।
যেখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল দুর্নীতি ও অহংকার
সেখানে ভরে দিলে তুমি নিয়ম-শৃঙ্খলার অলঙ্কার।
যেখানে ছিল না কাজের মধ্যে কোন গতি
সেখানে জাগিয়ে তুললে নতুন উদ্দীপনা ও জ্যোতি।
যেখানে ছিল না কারও শ্রমের মর্যাদা
সেখানে নিয়ে এলে তুমি অর্থের ব্যঞ্জনা।
হাউসমাস্টার, হাউসটিউটর, শ্রেণীশিক্ষক ভাতা
এ সবইতো তোমার স্বরচিত কবিতা।
৩০% বাড়িয়ে দিয়ে, নিলে তুমি হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা
মনের মণিকোঠায় লুকিয়ে আছে আরো কত আশা !
তা ব্যক্ত করার মত আমার মাঝে নেই কোন ভাষা।
অডিট অবজেকশনে থমকে গিয়েছিল কলেজের চাকা
তা নিরসনেও দেখতে পেলাম তোমার দৃঢ় দক্ষতা।
আটচল্লিশেও এ কলেজের আর্থিক মেরুদণ্ড হয় নি শক্ত
১৪ কোটির যোগান দিয়ে করলে তা পাকাপোক্ত।
কলেজ সুশোভিত প্রান্তরে প্রান্তরে,
এসবই তোমার নান্দনিক পদধূলিতে।
যে স্থান ভরা ছিল আবর্জনা ও ময়লার স্তূপে,
তা পরিণত করলে তুমি পিকনিক স্পটে।
হে মডেল কলেজের ত্রাণকর্তা কর্নেল জামান
আজ এই আনন্দসন্ধ্যায় তোমাকে জানাই সশ্রদ্ধ-সম্মান।

(২৮ মে ২০০৭-এ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে কর্নেল মোঃ কামরুজ্জামান খান এর আগমনের দৃশ্যপট এবং এর আগে ও পরের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এ কবিতাটি রচিত এবং ২৮ আগস্ট ২০০৮ তারিখ 'আনন্দ সন্ধ্যা' অনুষ্ঠানে পঠিত।)

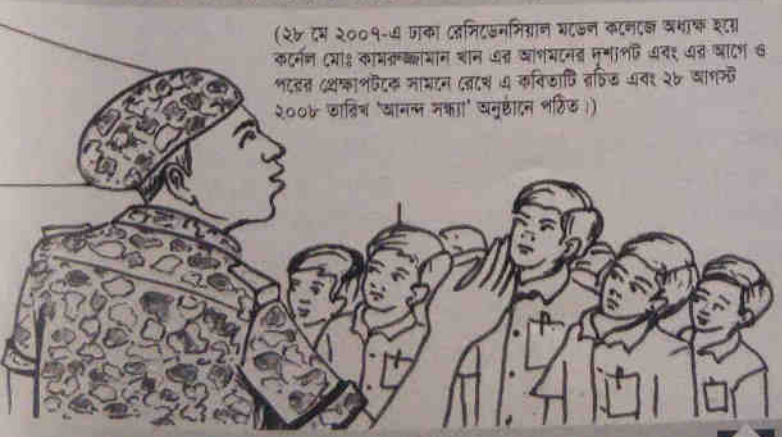

যত্ন

মোঃ আনোয়ার সাহাদাত
প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ

যত্নে রত্ন মেলে
অযত্নে ক্ষয়
সত্যে সাহস বাড়ে
মিথ্যায় বাড়ে ভয়।
সুশিক্ষায় প্রজ্ঞা বাড়ে
চরিত্র নির্মল হয়।
কুশিক্ষায় অবক্ষয় আনে
চরিত্র নষ্ট হয়।
দুষ্টলোক দলে ভারী
দাপট দেখায়,
দাপট যতই দেখাক না সে
অন্তরে তার ভয়,
দুষ্টরা সব এক হয়ে
সত্য মারতে চায়,
বিধাতা তখন হেসে কয়,
ওরে অবোধ, ওরে অবুঝ,
সত্য মারা অত সহজ নয়
সত্যকে মারতে চাইলে
নিজের মরতে হয়।
সত্যের লালন কর,
চরিত্র গঠন কর,
পরের ক্ষতির ভাবনা ছাড়,
নিজেকে মানুষ কর।

গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণ-কাহিনী

আমার হাউস জীবন

এ এ এম ফাইয়াজ রাহমান
কলেজ নম্বর : ১১০৬৬
শ্রেণী : তৃতীয় (প্রভাতী)

আমি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের কুদরত-ই-খুদা হাউসের একজন আবাসিক ছাত্র। আমি ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখে হাউসে উঠি। তখন আমার খুব ভয় হচ্ছিল আবার ভালও লাগছিল। আমার সাথে আমার মা, বাবা ও খালাত ভাই এসেছিলেন। আস্তে আস্তে হাউসের ছাত্রদের সাথে পরিচয় হল। তাদের অনেকেই আমার বন্ধু হল। আমিও তাদের বন্ধু হলাম। আমরা বন্ধুরা এখন মিলেমিশে থাকি। প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগত, পরে অবশ্য সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। তবে আমাদের একটা শিক্ষা হচ্ছে যে, আমরা মা-বাবা ছাড়াই প্রায় সব কাজ করতে পারছি। আর আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছেন হাউস মাস্টার সাবেরা সুলতানা ম্যাডাম। হাউস মাস্টার ম্যাডাম আমাদের যথেষ্ট খেয়াল করেন। আমি সবসময় দেখি তিনি আমাদেরকে অকারণে বকেন না বা মারেন না। আমরা যদি ভালভাবে থাকি, দুষ্টামি না করি তবে ম্যাডাম আমাদেরকে খুবই আদর করেন। আমাদের যে কোন প্রয়োজনে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন। আমি আমার হাউস জীবনকে স্মরণীয় করে রাখব। আমি এই জীবনকে কখনও ভুলব না। আমি আমার কুদরত-ই-খুদা হাউসকে খুব ভালবাসি।

ঘুরে এলাম সুন্দরবন

শাফকাত ইসলাম
কলেজ নম্বর : ৪১১২
শ্রেণী : পঞ্চম (দিবা)

প্রত্যেক বছর বার্ষিক পরীক্ষার শেষে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যাই। ২০০৬ সালে বার্ষিক পরীক্ষার শেষে আমরা সুন্দরবনে গিয়েছিলাম। ২৬ ডিসেম্বর কনকনে শীতের সকালে আমরা বাসে করে রওনা দিয়েছিলাম খুলনার উদ্দেশ্যে। তখন শৈত্যপ্রবাহ ছিল। বাসে উঠে কুয়াশার জন্য জানালা দিয়ে কিছু দেখতে পেলাম না। তাই বাসে ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। মা ডাক দিয়ে বললেন, "আমরা আরিচা ঘাটে পৌঁছে গেছি। জানালা দিয়ে তাকিয়েও কুয়াশার জন্য কিছু দেখতে পেলামনা। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। বেলা ২ টায় লাঞ্চ করার জন্য বাস থামল। লাঞ্চ করে সবাই ফিরে এলে বাস ছাড়ল। বিকাল ৫টার সময় খুলনা পৌঁছে গেলাম। নৌকা করে লঞ্চে উঠলাম। আমাদের রুমে ব্যাগ রেখে হাত-মুখ ধুয়ে হাল্কা নাস্তা দেয়া হলো। রাতে ডিনার শেষে ঘুমিয়ে গেলাম। পরদিন সকালেই লঞ্চ পশুর নদীতে প্রবেশ করল। তাড়াতাড়ি নাস্তা খেয়ে ছাদে উঠলাম। দুই পাশের ঘন বন উপভোগ করতে লাগলাম। বিকালে বনে হাঁটার জন্য ট্রলারে করে এক জায়গায় নামলাম। সেখানে কিছুই দেখি নি। সেদিনই ট্রলারে করে আরেক জায়গায় গিয়ে সেখানে বেশ কিছু হরিণ ও বানর দেখলাম। রাতে ডিনারের শেষে আমাদের বলা হলো, লঞ্চ কচিখালীর দিকে রওনা দিয়েছে। পরদিন সকালে আমরা একটি চর-এ নামলাম, সেখানে আমি গোসল করলাম ও বীচে খেললাম। বিকেলে আবার বনে নামলাম এবং এখানে একটি বন্য শূকরের পাল দেখলাম। অনেক হরিণ ও একটি বনমোরগ দেখলাম। কিন্তু বহু প্রতীক্ষিত 'বাঘ' দেখলাম না। সেদিন সন্ধ্যায় লঞ্চের টিভিতে রয়েল বেঙ্গল টাইগার এর উপর একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হল। পরদিন সকালে লঞ্চ খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। সেদিন সন্ধ্যায় লঞ্চের অনেকে গান গাইল, কৌতুক বলল, আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করলাম। সেদিন রাতে আমরা লঞ্চ থেকে নেমে গেলাম। ঢাকা ফেরার পরও সুন্দরবন ভ্রমণের দিনগুলোতে আমি যে পরিমাণ আনন্দ পেয়েছি তা ভুলতে পারি নি। সে আনন্দ মুখের ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তাই পাঠক আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, একটি বার গিয়ে সুন্দরবন ঘুরে আসুন, একটি বার অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করুন।

অন্য রকম প্রতিশোধ

রাইয়ান ইবনে ফয়েজ
কলেজ নম্বর : ৮৭৯৩
শ্রেণী : অষ্টম (প্রভাতী)

লালু ও মন্টু। লালু ক্লাস ফাইভে এবং মন্টু ক্লাস এইটে একই স্কুলে পড়ে। একদিন বিকালে তাদের দেখা হলো। মন্টু লালুকে প্রথমেই বলল- লালু বলত ট্রেন বেশি জোরে চলে, নাকি প্লেন বেশি ? লালু বলল- কেন প্লেন বেশি জোরে চলে। মন্টু বলল- আরে বোকা, এই সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলি না। তুই জানিস না ট্রেন বেশি জোরে চলে। লালু বলল- কী বোকার মত কথা বলছেন মন্টু ভাই। মন্টু বলল- তোর মত গাধার সাথে আমার কথা বলাটাই ভুল হয়েছে। লেগে গেল তর্ক। এমন সময় তাদের স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক মনসুর আলী তাদের তর্ক দেখে এগিয়ে এলেন। তাকে দেখেই লালু বলল- দেখেন তো স্যার মন্টু ভাই বলে ট্রেন নাকি প্লেনের চেয়ে জোরে চলে। স্যার বললেন- মন্টু, তুই সত্যি এ কথা বলেছিস? মন্টু বলল- জ্বি স্যার। স্যার বললেন- ছিঃ ! তোর মত ছেলে এ কথা বলতে পারে, ভেরি ব্যাড। লজ্জা অপমানে মন্টুর মুখ লাল হয়ে গেল। লালু বলল- দেখছেন মন্টু ভাই, স্যার কি বলে গেলেন। হেঃ ! হেঃ ! আমার কথা ঠিক না আপনার কথা ঠিক? তখন মন্টু মনে মনে ভাবতে লাগল কত ধানে কত চাল তা তোকে কালকেই দেখাবো।

পরদিন সকালে মন্টু লালুর চেয়ে আগে এসে তার ক্লাসে ব্যাগ রেখে লালুর ক্লাসে গেল। গিয়ে দেখল লালুও এসে গেছে। লালুর ক্লাসে পিংকু নামের ছেলেটির সঙ্গে লালু কী নিয়ে তর্ক করছে। মন্টু ক্লাসের দরজায় দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনতে পেল যে তাদের তর্কের বিষয় হচ্ছে কার ঘড়ি বড়। মন্টু দেখল লালুরটাই বড় কিন্তু সে বলবে পিংকুরটা বড়। এই ভেবে সে তাদের কাছে এগিয়ে এল।

মন্টু বলল দেখি দেখি কার ঘড়ি বেশি বড়। কিছুক্ষণ ভাবার ভান করে সে বলল- পিংকুরটা বড়। তখন লালু রেগে গিয়ে বলল আমারটা এত বড় আর আপনি বলছেন পিংকুরটা বড়। না বুঝে কথা বলা ভালো না। একথা বলার সাথে সাথে মন্টু লালুর গালে কষে চড় লাগিয়ে দিল। লালুর চোখে পানি এসে গেল। পিংকু মুখ টিপে হাসছিল। ঠিক এই সময় বাংলার শিক্ষক ফারুক স্যার লালুদের ক্লাসে ঢুকলেন। তিনি লালুর চোখে পানি দেখে তাকে বললেন কী হয়েছে লালু? লালু চোখ মুছে বলল মন্টু ভাই আমাকে অকারণে চড় মেরেছে। মন্টু তো অবাক, অকারণে! স্যার মন্টুর দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন ও, তুই।

মন্টু কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে স্যার মন্টুর কান ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সামনে এনে বললেন- একশ বার কান ধরে উঠ বস কর। মন্টু আবার কিছু বলতে গেল, কিন্তু স্যার এবার কড়া ধমক দিলেন তাকে। লজ্জায় অপমানে মন্টুর মুখ লাল হয়ে গেল। এবার মন্টু অনেক বেশি লজ্জিত হল কারণ ছোটদের সামনে কান ধরে উঠ-বস করা মানে অনেক লজ্জা। এবার লালু বেশ মজা পেল এবং মনে মনে ভাবল ছোটদের অন্যায়ভাবে মারার ফল এবার বোঝেন।

কল্পকথা

মোঃ ফাহাদ রহমান
কলেজ নম্বর : ৯৯৯৩
শ্রেণী : একাদশ (প্রভাতী)

আমি লেজার গান অন করতেই স্পেসস্যুট পরা প্রাণীটি কাতর কণ্ঠে বলে উঠল,
"দয়া করে আমাকে মেরো না।"
কাচের আড়ালে প্রাণীটির মুখ ঢাকা থাকলেও আমি বুঝতে পারছিলাম প্রাণীটি ক্লান্ত।
'তুমি কোথা থেকে এসেছ ?'
'ঐ এন্ড্রোমিডার কাছে একটি ছোট নক্ষত্রকে ঘিরে কিছু গ্রহ ঘুরছে, তার একটি থেকে।'
এন্ড্রোমিডার নাম শুনে আমার সতর্ক হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু যখনই আমার মনে হয়েছে এই অজানা প্রাণীটি ক্লান্ত, তখন থেকেই আমার এই প্রাণীটির জন্য কিছু দয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, যা একজন প্রতিরক্ষা কর্মীর জন্য পুরোপুরি অনুচিত।
'তুমি কেন এসেছ এই গ্রহে ?'
'আমি এসেছি আমার বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে। একটি প্রজাতির শেষ বংশধর হিসাবে আমার কর্তব্য পালন করতে।' আমার মন কৌতূহলী হয়ে উঠল।
'কেন তোমার সম্প্রদায়েরই বা কী হয়েছিল ?'
'আমার স্বজাতিরা এথেন্ডিয়া ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। প্রথম যখন তারা এটা আবিষ্কার করেছিল তখন তারা বুঝতে পারে নি এটা যে ক্ষতিকর। কিন্তু যখন বুঝল তখন আর কিছুই করার ছিল না। এই ভাইরাস সরাসরি মস্তিষ্কে আঘাত হানে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আক্রান্ত জনের লাশ ছাড়া কিছুই থাকে না। ভাগ্যের নিষ্ঠুর সাক্ষী হয়ে এখন এই হতভাগাটাই বেঁচে আছে।'
'কিন্তু তুমি কি জাননা এই গ্রহে কোন কলোনী তৈরী করা সম্পূর্ণ নিষেধ ?'
'আমার জানা আছে কিন্তু কিছুই করার নেই। একমাত্র এই নির্জন গ্রহটাই আমার প্রজাতির বিকাশের জন্য উপযুক্ত। আমার যানটিতে সুরক্ষিত টিউবে শিশু ক্লোন আছে। আছে দক্ষ রোবট যারা এদেরকে ধীরে ধীরে বড় করে তুলবে আবার নতুন করে বিকাশ ঘটবে একটি ধ্বংস হয়ে যাওয়া সভ্যতার। তুমি আমাকে বাধা দিও না। আমাকে দয়া করে আমার কাজ করতে দাও।'
'তোমাকে তার আগে স্টার কমান্ড থেকে অনুমতি নিতে হবে। তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি তোমার জন্য বিশেষ আবেদন করবো। স্টার কমান্ড তোমার প্রজাতির নিরাপত্তা দেবে, তোমার প্রজাতিকে স্বীকৃতি দেবে। তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। একদিন তোমার প্রজাতি আবার সভ্যতা গড়ে তুলবে।'
'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমার হাতে যে একদম সময় নেই। আমি এখানে আসতে অনেক দুঃস্বপ্ন পার করেছি। আমার কাছে কোন খাবার ছিল না, অস্ত্র ছিল না। তবু এই মহৎ কাজটি করতে এতদূর পথ পাড়ি দিয়েছি।'
'দাঁড়াও আর একটু তোমার আইডেনটিফিকেশন করতে হবে। তাড়াতাড়ি মুখ থেকে ঢাকনা সরাও।' কথাবার্তার এই পর্যায়েই বোধ হয় ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা আত্মপ্রকাশ করে। আমি তখনও বুঝতে পারি নি কেন এই অসহায় প্রাণীটি মুখ দেখাতে ইতস্তত বোধ করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দেখাতে বাধ্য হয়েছিল এবং তারপর যা হয়েছিল, তা ছিল সত্যিই একটা দুঃস্বপ্ন। আমি কখনও বুঝতে পারি নি যে, আমাকে এই বিদঘুটে প্রাণীটির মুখোমুখি হতে হবে। যে মানব সারা বিশ্বজগতের জন্য ত্রাস ছিল। সেই মানব আমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা পর্যন্ত চেয়েছে। এমন একসময় ছিল মানবজাতির নামে যেকোন শিশু পর্যন্ত শিউরে উঠত আর এখন তারাই ধ্বংসের মুখোমুখি। তাকে দেখে রাগে, ঘৃণায় আমার গা কাঁপতে লাগল। আমি বুঝতে পারছিলাম সৃষ্টিকর্তা আমাকে হয়ত এই মহৎ কাজের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। অনেকটা ঘোরের ভিতরই লেজার গানের ট্রিগার চেপে দিলাম কারণ এই বিশ্বজগৎ থেকে দুঃখ দূর করতে আমার তখন আরও অনেক কিছু ধ্বংস করার ছিল।

ক্ষুদে ড্রাইভারের কীর্তি !

ঐশিক রহমান সিদ্দিকী
কলেজ নম্বর : ৯০৫৩
শ্রেণী : একাদশ (প্রভাতী)

আমি তখন ৩য় শ্রেণীতে উঠেছি মাত্র। বয়স সাত-আট হবে। আমাদের একটি জাপানি "মিট্সুবিসি ল্যান্সার" গাড়ি ছিল। ঢাকায় তখন টয়োটা গাড়ির সংখ্যাই ছিল বেশী। কিছু কিছু ডাটসান, নিশান ও অন্যান্য গাড়ি। এসবই জাপানি গাড়ি। টয়োটারই জয়জয়কর। অবশ্য আমার বাবা বলতেন মিট্সুবিসিই সেরা। শুনেছি, তাঁর প্রথম জীবনে তিনি ভক্সওয়াগন চালাতেন। ওগুলো ছিল জার্মান গাড়ি। নামে ওয়াগন হলে কী হবে- ছোটখাট নাক চ্যাপ্টা দুই দরজার তেজী গাড়ি। প্রচণ্ড স্পিড ছিল সেই গাড়ির! রেডিয়েটর বিহীন গাড়ি, পেছনে ইঞ্জিন। রেডিয়েটরের ভিতর প্রতিদিন পানি ঢালতে হয়। যার কাজ হলো ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা রাখা। এই গাড়ির সেই কাজটি করত বাইরে থেকে বাতাস চলাচলের জন্য দু'টি হোস পাইপ। জার্মানিতে নাকি কৃষকেরা এই গাড়ি চালাতেন। বাচ্চাদের পিছনে বসিয়ে কৃষি কাজে চলে যেতেন ৮০-৯০ মাইল দূরের মাঠে। দুই দরজা সামনে থাকায় বাচ্চারা পিছনে নিরাপদ। উচ্চবিত্তের ধনী পরিবারগুলি সবসময় চালাত জার্মানির মারসিডিজ বেঞ্জ, শেভরোলেটের ইম্পালা। ছোট বেলায় গাড়ি আমাকে খুবই আকর্ষণ করত। রাস্তার উপর চলাচলের জন্য এক শতাব্দী ধরে মোটর গাড়ির অবস্থান সবার উপরে। যখন তখন এই গাড়ির আকর্ষণে এর আশপাশেই আমি ঘুরঘুর করতাম। গাড়ি ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে মুছতাম, কারপলিস ক্রিম লাগিয়ে চকচকে করতাম- আমার ছোট ছোট হাত দিয়ে ! গাড়ির ব্রান্ডের নাম ও দাম জানার আগ্রহ, গাড়ি চালানোর কলাকৌশল রপ্ত করার প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল আমার। আমার বাবা নিজেই যেহেতু গাড়ি ড্রাইভ করতেন এবং নিজেই এর যত্ন নিতেন, বিশেষ করে প্রতি ছুটির দিন বা শুক্রবার সকাল থেকে আমি আশেপাশেই থাকতাম। তাঁর কাজের পারদর্শিতায় আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ছুটির দিনে আব্বু নিজে নিজেই গাড়ির সব খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখতেন। গাড়ির এই খুঁটিনাটি কাজ- মোবিল ঢালা, ব্যাটারিতে ডিসটিলড ওয়াটার পূরণ করা, গিয়ার ওয়েল, ব্রেক ওয়েল চেক করা, কার্বুরেটর, চারটি প্লাগ পরিষ্কার করা, রেডিয়েটরে পানি ঢালা থেকে শুরু করে ধোয়া মোছা প্রতিটি কাজে আমি খুবই আগ্রহ বোধ করতাম। আমি এসব সম্পর্কে আমার বাবাকে অনেক প্রশ্ন করতাম। তিনি একটুও বিরক্ত না হয়ে সমস্ত প্রশ্নের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জবাব দিতেন। গাড়ির যন্ত্রকৌশল যে খুব সহজ নয়, সেটি আমি খুব ছোটবেলা থেকেই উপলব্ধি করেছিলাম। এই প্রসঙ্গে কিছু বলা আবশ্যক মনে করছি এই জন্যে যে আমাদের দেশে প্রতিনিয়তই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটছে, যার জন্য মূলত: দায়ী গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও গাড়ি চালকদের অসচেতনতা, গাড়ি যেমন একটি সেরা যানবাহন; তেমন এটি খুবই 'সফিসটিকেটেড'।অনেক যন্ত্রই যে প্রতিনিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করা জরুরী' সে বিষয়ে অনেক চালকই থাকেন উদাসীন। বর্তমানকালের মোটর ইঞ্জিনের নাম অন্তর্দহ ইঞ্জিন বা ইন্টারনাল কম্বাশশন ইঞ্জিন যা আমি ছেলেবেলায় বাবার কাছে শুনেছিলাম বটে কিন্তু এর কার্যক্রম ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বুঝি নি পুরোপুরি। বড় হয়ে পদার্থ বিজ্ঞান পড়ে ভাল করে জেনেছি। এই অন্তর্দহ ইঞ্জিন চলে পেট্রোল-ডিজেল বা গ্যাসোলিন দিয়ে। দিনে দিনে মোটর গাড়ির আকার আকৃতি এবং ইঞ্জিনের কতই না পরিবর্তন হচ্ছে। পুরনো মডেলের গাড়ির জায়গায় আজকাল কত অভিনব আরামদায়ক গাড়িরই না প্রচলন হয়েছে। আমাদের পুরনো গাড়িটি যদিও ছিল আরামদায়ক, ঠাণ্ডার জন্য কুলিং সিস্টেম, বেতার বা ট্রানজিস্টার শোনার জন্য রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার; দূরের যাত্রায় বাক্সপেঁটরা রাখার জন্য প্রশস্ত বুট এবং দু'টি এমপিফ্লায়ার? সিটের পিছনের প্রশস্ত বেশ কিছু জায়গা। আগে যেমন বলেছি ছুটির দিনে আব্বু নিজেই গাড়ি ধোয়া মোছা এবং সার্ভিসিং এর কাজ করতেন, আর আমি ছিলাম তাঁর সকল কাজের হেল্পার। গাড়ি মোছামুছি থেকে আমি যে বিষয়ে বেশী আগ্রহ পেতাম, তা ছিল গাড়ি চালানোর বিষয়টিকে রপ্ত করা। ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হতো। আমি এ সম্পর্কে আব্বুকে অনেক প্রশ্ন করতাম। তিনি একটুও বিরক্ত না হয়ে আমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতেন। এভাবে প্রশ্ন করতে করতে ওই বয়সেই আমি একসময় গাড়ি চালানো মোটামুটি শিখেই ফেললাম। খুবই সহজ ব্যাপার। আমাদের গাড়িটি ছিল ম্যানুয়াল অপারেটিং অর্থাৎ গিয়ারে চালিত। গিয়ার পাল্টানোটাই আমার কাছে কঠিন মনে হতো। কিন্তু আস্তে আস্তে সেটিও মোটামুটি বুঝে ফেললাম।

প্রথম চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দেওয়ার পর ক্লাচ চেপে ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়লে এবং এক্সেলেটরে হালকা চাপ রাখলেই গাড়ি চলতে থাকবে। এরপর পর্যায়ক্রমে সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার এবং প্রয়োজনে ব্যাক গিয়ার। একবার রপ্ত হয়ে গেলে সবটাই একটা অভ্যাসের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যাবে। কাজেই গাড়ি চালানোতে দুই হাত, দুই পা, চোখ, নাক, কান সবই সজাগ রাখতে হয়। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একসাথে কাজ করে। এসব জিনিস আমার ছোটবেলা থেকেই শেখা। শুধু অভাব ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার। এই অভিজ্ঞতাটাও একদিন অর্জন করা হয়ে গেল। কেমন করে? সেই কথাই এখন বলব---- সেদিনটা ছিল শুক্রবার, ছুটির দিন। আমাদের গাড়ির রুটিন চেকআপ-ডে। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলাম আব্বুর সাথে গ্যারেজে যাবার জন্য। আব্বু তখনও ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হন নি। আমি আব্বুকে জিজ্ঞেস করলাম- 'গ্যারেজে যাব না?' আব্বু হাই তুলতে তুলতে আমার হাতে গাড়ির চাবিটা দিয়ে বললেন 'তুমি নিচে গিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে কাচগুলো নামাতে থাক। এর মধ্যে আমি চলে আসব।' তিন তলা থেকে নেমে গ্যারেজে পৌঁছেই আমার মাথার মধ্যে ততক্ষণে বিস্ফোরণ ঘটে গেছে এক নতুন চিন্তার।বুকের ভিতর দড়াম দড়াম শব্দ হতে লাগল, নিঃশ্বাস দ্রুততর হতে লাগল, কেননা তখন আমি এক দুষ্ট ফন্দি এঁটে ফেলেছি। গ্যারেজের দিকে গেলাম। কলাপসিবল গেটটা খুললাম। গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে ড্রাইভিং সিটে বসলাম। খানিকটা হতাশ হলাম। কারণ তখন লম্বায় অনেক ছোট ছিলাম। পায়ের কাছে ক্লাচ, ব্রেক আর এক্সেলেটর পর্যন্ত পা পৌঁছাত না। অনেক চেষ্টা করে ড্রাইভিং সিটে ঢালু হয়ে বসে অতটুকু পর্যন্ত মোটামুটি পা দিলাম। তারপর চাবি দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। এবার শুরু হলো আমার অভিযাত্রা! ক্লাচে পা দিয়ে গিয়ার চেপে ব্যাক গিয়ার ফেলে যেভাবে শিখেছি সেভাবে আস্তে আস্তে ক্লাচ থেকে পা উঠাতে লাগলাম আর এক্সেলেটরে পা চাপতে লাগলাম, গাড়ি পিছনে যেতে লাগল। গাড়ি গ্যারেজ থেকে সোজা পিছনে বের হয়ে গেল। তারপর আবার ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে স্টিয়ারিং ডানদিকে ঘুরিয়ে গাড়ি রাস্তা বরাবর সোজা চালানো শুরু করলাম। ততক্ষণে আব্বু সমূহ বিপদের কথা আঁচ করতে পেরে আমাকে থামানোর জন্য সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত ছুটে আসছিলেন। আমাকে আর পায় কে! ফার্স্ট গিয়ারে রেখেই গাড়ি সামনের দিকে নিয়ে যেতে লাগলাম। একটু সামনে গিয়ে গাড়ি ডানদিকে গলিতে ঢোকালাম। ততক্ষণে চারদিকে অনেক উত্তেজনা ছড়িয়ে গেছে। একটা বাচ্চা ছেলে গাড়ি চালাচ্ছে! এই দুর্লভ দৃশ্য দেখার জন্য পাড়ার অনেক মানুষ রাস্তায় নেমে এল। আমার তো গর্বে বুক ফুলে গেল। নিজেকে কেমন বড় বড় মনে হচ্ছিল। আমি এমন মুখভঙ্গি করলাম যেন এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার । কিছুক্ষণ পরে দেখি গাড়ির পিছে পিছে আমার বয়সী একদঙ্গল দর্শক হাততালি দিতে দিতে ছুটছে। আমি আগ্রহ পেয়ে গিয়ার পরিবর্তন করে গাড়ির গতি বাড়াতে লাগলাম, যা ছিল অনেক বড় দুঃসাহসের কাজ। তবে এই দুঃসাহস আর দেখানোর সুযোগ হলো না। কারণ গাড়িটা হুট করে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। সম্ভবত গিয়ার পাল্টাতে আর ক্লাচ চাপ দিতে কোন ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমি দ্বিতীয় বার স্টার্ট দেওয়ার আগেই আব্বু দৌড়ে এসে আমাকে গাড়ির ভেতর পাকড়াও করে ফেললেন। ততক্ষণে গাড়ির সামনে পেছনে অনেক লোকের সমাগম ঘটল, ব্যাপারটা কী হয়েছে তা বোঝার জন্য। অনেকেই কিছু না কিছু ধারণা করে নিচ্ছিল। কারো কারো কথা আমার কানে আসতে লাগল। কয়েকজন বলেছে-' মনে হয় বাড়ি ছাইড়া ভাগতাছিল! কী ত্যান্দোর পোলা।' এরকম আরো অনেক আজগুবি উক্তি শুনতে লাগলাম। শুনলাম আরেকজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন, 'মনে হয় গাড়িটা চুরি করার মতলব ছিল। কোন বড় 'গ্যাঙের লগে' লাইন থাকতে পারে। দিনকাল যা পড়ছে।' আব্বু ততক্ষণে গাড়িতে উঠে সবার উদ্ভট ধারণা ভেঙে দিয়ে গাড়ি সমেত আমাকে নিয়ে বাসায় চলে আসলেন। আব্বু আম্মুকে কিছুই জানালেন না। আমাকেও কিছুই বললেন না। শুধু বললেন, ' বাবা, কৌতূহলী হওয়া খুব ভাল, কিন্তু কৌতূহলের একটা সীমা থাকা ভাল।' কথাটির তাৎপর্য তখন বুঝি নি। এখন বুঝি। কিন্তু যাই হোক এটা ছিল আমার একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আমার জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর কোন অভিজ্ঞতার কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি এটাই উলেখ করি। এই স্মৃতি আমি কখনো ভুলি নি। আমার গাড়ি চালানোর প্রথম 'রোমাঞ্চকর' অভিজ্ঞতা।

অপূর্ব স্বস্তি

মোঃ নাহিদ ইসলাম
কলেজ নম্বর : ৮৯৫৬
শ্রেণী : একাদশ (প্রভাতী)

একটানা অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি পড়ছে। ঝমঝম আওয়াজ তুলে নির্লজ্জের মত ঝরে চলছে। একই সাথে বর্ষণ হচ্ছে নীরবের চোখে। চৌদ্দ শিকের ছোট গুমোট ঘরটিতে বসে কান্নার চোটে তার শরীর বারবার কেঁপে উঠছে। অতীত স্মৃতিগুলো একের পর এক তার চোখে ভাসছে। একসময় তার কান্না থামল। নিজেকে নিজেই বোঝালো এভাবে কেঁদে কোন লাভ নেই। কান্নার ভাষাটা পড়ার সাধ্য সবার নেই। তার চেয়ে বরং শব্দের মাঝে তার কথা থাকা ভাল একটুকরা কাগজে লিখতে শুরু করল-

গাইছি আমি, শুনছ তুমি
হে উত্তাল প্রকৃতি!
কাঁদছি আমি, ঝরছ তুমি
এই কি তোমার নিয়তি?
হে প্রকৃতি, রং দাও মোরে, আলো দাও মোরে
যাব আজ আমি বহু বহু দূরে।
বাতাস ছেড়ে আকাশ ছেড়ে
যাব আজ আমি আলো রং নিতে
পথ দাও মোরে, নিয়ে চল দূরে।
ক্লান্ত আমি আজ শান্ত শহরে
নাও মোরে কাছে টেনে।
দেখছে সবাই, শুনছে সবাই
বলছে না কেউ কিছু
বন্ধু তুমি, স্রষ্টা তুমি
বাঁচাও এই ধরিত্রীরে।

লেখা শেষ করে বাইরে তাকালো। ছোট জানালা দিয়ে এক টুকরো আকাশ দেখা যাচ্ছে। স্বচ্ছ, সাদা হাসিমুখে যেন তার সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল নীরব। না, আকাশের মত স্বাধীন সে নয়। আকাশের সাথে তার বন্ধুত্ব হতে পারে না। সে বন্দী, একজন খুনের অপরাধী। একটা জঘন্য পশু হত্যা করে সে আজ আসামী। কিন্তু এতে তার কোন আক্ষেপ নেই, দুঃখ নেই বরং আছে আনন্দ, আবর্জনা দূর করে জগতের উপকার করার আনন্দ।

জীবনটা এতটা খারাপ হবার কথা ছিল না। তেমনটাই মনে হয় নীরবের। ধনী বাবার একমাত্র ছেলে হওয়ার কারণে কষ্ট বলতে কী বোঝায় তা তার শেখা হয় নি। বাবার মেজাজ অনেক কড়া ছিল। তাঁর একমাত্র ছেলেকে মনের মত করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। নিয়মিত পড়াশুনার বাইরে অন্য কিছু নিয়ে ভাবার ব্যাপারে তাঁর অনেক আক্ষেপ ছিল। ঘরবন্দী নীরবের ছেলেবেলা কাটে বই পড়ে ও কম্পিউটার নিয়ে। কিন্তু তার বাবার তৈরী মনের আড়ালে তার নিজস্ব যে মনটি আছে তা ছিল সৃজনশীল, সুন্দর, সজীব। সময় পেলেই খাতা কলমের মাধ্যমে মনের কথা গুলো লেখার অসাধারণ দক্ষতা তার ছিল; কিন্তু নিয়তি তার প্রতিভার মূল্য দিল না। স্কুল, কলেজ শেষে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর বাইরের জগতের সাথে তার পরিচয় হলো। কিন্তু সে পরিচয়ের স্মৃতি সুখকর নয়। নীরব নিজেকে আবিষ্কার করল সময় থেকে পিছিয়ে পড়াদের দলে। কিন্তু এতে তার কোন দুঃখ ছিল না। নিজের ঘরে ডায়েরিতে মনের কথাগুলো নিয়ে খেলা করার মাঝে সে আনন্দ খুঁজে পেত।

নীরবের মা ছিলেন খুবই সাদাসিধে মহিলা। গ্রামে বড় হয়েছেন। নীরবের বাবা যখন সাধারণ একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন তখন মায়ের বিয়ে হয়। কিন্তু এতদিনে বাবার অবস্থার আমূল পরিবর্তন। বিরাট ফ্ল্যাট, জমিজমা, ব্যাংক-ব্যালেন্স সব মিলিয়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। নীরবের মায়ের এসবে কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি তাঁর মত জীবন যাপন করতেন। ঘরের ফার্নিচারের সাথে তাঁর কোন পার্থক্য ছিল না। স্বামীর সেবা ও সন্তানের সেবাই যেন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সবকিছু ঠিকভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন নীরব দেখলো দেশে ঝড় বইছে। তবে কোন প্রাকৃতিক ঝড় নয়। শাসন ব্যবস্থায় ঝড়। দেশের কোন ব্যাপার নিয়ে সে কখনো ভাবে নি। কারা দেশের ভাল চায়, কারা দেশের মন্দ চায়, তা ভাববার প্রয়োজন তার কখনো হয় নি।

তবে এবার তার কিছুটা আগ্রহ জন্মালো। নিয়মিত পত্রিকা পড়ে সে অনুমান করে যে, দেশ যারা এতদিন শাসন করেছে, তথা শোষণ করেছে তাদের দিন শেষ। সবার সাজা হচ্ছে। দেশ আলোর মুখ দেখছে। নীরব ব্যাপারটা সমর্থন জানালো মনে মনে। নিজের দেশের সম্পর্কে তার মাথা ব্যথা শুরু হলো। এখন প্রতিদিন সকালে তার একটাই কাজ- খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া। এসব খবর পড়ে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। মনে মনে এরকম দেশের শত্রুদের কঠোর শাস্তির দাবি জানালো। দেশের এই অবস্থার মধ্যে একদিন সন্ধ্যার পর সে বাসায় ফিরে তার ঘরে গেল। জামা কাপড় খুলে ফ্যানের নিচে বসে খবরের কাগজটা হাতে নিল। কী কারণে যেন আজ সকালে খবরের কাগজ দেয় নি। তাই সে নিজেই একটা কাগজ কিনে নিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পড়ার পর দেখল দুর্নীতিবাজদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। নামগুলো পড়তে পড়তে একটা নামে এসে তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। মাথা ঘুরতে লাগল। সে আবার পড়লো। না, ঠিকই কিন্তু দেখছে সে, এতো তার বাবার নাম। সে ভালো ভাবে বিস্তারিত পড়লো। সবই ঠিক আছে। ঠিক এ সময় তার মায়ের গলার আওয়াজ পেল সে। মা চিৎকার করে কী যেন বলছেন। এরপর বাবার গলার আওয়াজ পেল সে। তার জীবনে মাকে কখনো বাবার সাথে ঝগড়া করতে দেখে নি সে। ঘর থেকে বেরিয়ে এল নীরব। বাবার ঘরের সামনে আসতে তার শরীর কেঁপে উঠল। সারা ঘরে কতগুলো দলিলের টুকরো। এর মাঝে মা পেটে হাত দিয়ে বসে আছে। বাবার হাতে খোলা বেল্ট। মা চিৎকার করে বলছে, " তোমার অবৈধ সম্পত্তি আমি কখনও আমার নামে নেব না। তুমি শাস্তিরই যোগ্য, তোমার পাপ আমি কখনো আমার ঘাড়ে নেব না।" একথা বলার সাথে সাথে বাবা মায়ের পেটে আরেকটা লাথি মারলো এবং একের পর এক বেল্ট দিয়ে মায়ের চোখে মুখে আঘাত করতে লাগল। নীরবের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে বাবাকে বাধা দিতে গেল কারণ এতক্ষণে তার কাছে সব পরিষ্কার। বাবা তার দুর্নীতির নোংরা বোঝা মায়ের পবিত্র পিঠে চাপিয়ে দিচ্ছে। দ্বিতীয়বার বাধা দিতে গেলে নীরবকে ধাক্কা দিয়ে তার মাকে দ্বিগুণ ক্রোধের সাথে মারতে লাগল। এবার নীরব নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না। মায়ের পবিত্র রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। এই ব্যথা সে সহ্য করতে পারল না। ঘর থেকে বেরিয়েই তার নজরে একটা মোটা রড পড়লো। সেটা হাতে উঠিয়ে নিয়ে সে ঘরে এসে দেখলো মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে । আর বাবা তাকে তখনো মেরে চলেছে। নীরবের সমস্ত রাগ-দুঃখ তার হাতে ভর করল। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তার জন্মদাতা বাবার মাথায় আঘাত করল। তার বাবা শুধু একবার ঘুরে তাকালো। এরপর ধপ করে পড়ে গেল। নীরবের হাত থেকে রডটা পড়ে গেল। সে তার মায়ের পাশে বসে ডুকরে কেঁদে উঠলো। কিন্তু সে কান্নার শব্দ যেন লক্ষ কোটি মানুষের হাসির শব্দে বদলে গেল। সুখের হাসি, মানুষের প্রাণখোলা হাসি। আর সেই হাসির নায়ক আর কেউ নয় নিজের পিতার হত্যাকারী নীরব। সেদিন কেন সে হাসতে পারে নি, এজন্য তার মনে ক্ষোভ হয়। সে তো বাবাকে মারে নি। মেরেছে এক পশুকে। দেশের ভালোর জন্য এরকম পশুর মৃত্যু প্রয়োজন, যারা টাকার লোভে নিজের সন্তান, স্ত্রীকে জ্বলন্ত আগুনে ঠেলে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। আর আজ তাই নীরব গর্বিত। গর্বিত একজন হত্যাকারী !!!

জীবন-জীবিকার কথকতা

আব্দুল্লাহ্ ইনাম তালহা
কলেজ নম্বর : ৯০৯২
শ্রেণী : দশম (প্রভাতী)

"জীবন " তিন বর্ণের এই শব্দটি কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী, তাৎপর্যবহুল, মূল্যবান। এই জীবনের জন্যই মানুষ সর্বদা এক নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে রত। কেবল জন্মানো, পৃথিবীতে সময় অতিবাহিত করা, একদিন মারা যাওয়া এর মধ্যে জীবনের তাৎপর্য নিহিত নয়। প্রতিটি শিশুই এই বিশাল বিপুলা পৃথিবীতে আসে নতুন কিছু প্রতিভা, নতুন কোন আশা নিয়ে। কেউ তা বাস্তবায়ন করতে পারে । আবার কেউ তাতে ব্যর্থ হয়। এই ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমেই তো এগিয়ে চলছে পৃথিবী, সৃষ্টি হচ্ছে সভ্যতা। প্রকৃতপক্ষে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষের জন্য কিছু করা তা ক্ষুদ্রই হোক আর বৃহৎই হোক, অসত্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই জীবনের মহত্তম কাজ। আর এজন্য প্রথমেই কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্মে এলে চলবে না। তবে উচ্চাশা তো থাকতেই হবে, কিন্তু তার একটা সীমা থাকতে হবে। পৃথিবীতে মহৎ যা কিছু হয়েছে সবই শুরু হয়েছে একেবারে গোড়া থেকে, নিম্নস্তর থেকে। দুইটি উদাহরণ দেয়া যাক-মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) এর জন্ম হয়েছিল এমন এক সময়, যা ছিল বিশ্বের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সেই অন্ধকার থেকে শিক্ষা নিয়েই মানুষকে আলোর পথে এনেছেন তিনি। সৃষ্টি করেছিলেন এমন এক নব অধ্যায়, নবযুগ যা বিশ্বের ইতিহাসে চির অম্লান। ইসলামের চিরশত্রু ইয়াহুদীরাও সে যুগকে নিয়ে আজো গবেষণা চালাচ্ছে আর হচ্ছে অভিভূত।

তেমনি গৌতম বুদ্ধ যতদিন রাজপরিবারের আরাম, আয়েশ, বিলাসে দিন কাটিয়েছেন ততদিন তিনি জীবনকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। ঘটনা ক্রমে যখন তিনি মানুষের দীনতা-হীনতা, কষ্ট, বেদনা স্বচক্ষে দেখলেন, অনুধাবন করলেন জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। সাধারণ মানুষের কাছে নেমে এসে মানুষকে দিলেন মুক্তির পথ। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানব কল্যাণে কিছু করতে হলে ভালো মন্দ উভয়দিকই সমানভাবে বিবেচনা করতে হয়। এরপর মন্দকে পরিহার করে ভালোর পথ ধরে চলতে হয়। তবে এসময় আরেকটা জিনিস লক্ষ রাখতে হয় যে- ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয় (প্রমথ চৌধুরী)। তাই ভালোর পাশাপাশি মন্দকে দেখার সময় নিজেকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। সেই সাথে সহ্য করতে হয় অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা, দু:খ-বেদনা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত। আর তবেই অমানিশা কেটে গিয়ে উঁকি মারে সোনালি সূর্য। এসবে হতাশ হলে চলবে না। চীনা প্রবাদ আছে- " দুঃখের পাখিকে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দিও, কিন্তু বাসা বাঁধতে দিওনা"। সকল মানুষেরই মহৎ কিছু করার সামর্থ্য আছে। পরিবার, সমাজ, দেশের সামগ্রিক সহায়তায় সে সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সেই মহৎকর্ম সাধিত হয়। কিন্তু সকলে তা করতে পারে না। তা নিজের দোষেই হোক, আর অন্য কারণেই হোক। কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ নেই। আসলে মানুষ সবকিছুর কাছেই ঋণী। জন্মের পর অসহায় মানবশিশু পৃথিবীর আলো, বাতাস, মাটি, পানির সাহায্যেই দৈহিকভাবে বেড়ে ওঠে আর মানসিকভাবে বিকাশের জন্য মা, বাবা, ভাই বোন শিক্ষক, আত্মীয় স্বজন, সহপাঠী সকলেই তার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু মানুষ এসবের কথা চিন্তা করে না। যে হতদরিদ্র চাষীর জন্য আমরা এতো সুস্বাদু খাদসামগ্রী খেতে পারছি, অর্ধাহারে, অনাহারে থাকা সে চাষীর কথা ক'জনে ভাবে? যেই শ্রমিকের হাড়ভাঙা খাটুনিতে তথাকথিত জীবন উপভোগ করি, সেই শ্রমিকের উপকারে আমরা ক'জন কাজ করি? আমরা শুধু এই ভাবনায় মগ্ন থাকি যে, কবে আরেকটা বাড়ি বা প্লট কিনতে পারব, নিউ মডেলের গাড়িটা কবে কিনব, কবে আরো কিছু অর্থ আত্মসাৎ করে সহকর্মীর চেয়ে অগ্রগামী হতে পারব। আর এজন্যই আজ স্বাধীনতার প্রায় ৪০ বছর হতে চলেছে আর আমরা একটি পরাধীন দেশের মানুষের মতোই নিম্নপ্রকৃতির জীবন-যাপন করছি। কিন্তু আমাদের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। নিজের স্বার্থোদ্ধারে ব্যস্ত আমরা সকলে। তবে এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। এই চরম দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তরুণ সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। আত্মমর্যাদা, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। উদ্ধার করতে হবে প্রাণপ্রিয় এই দেশকে, এদেশের নিসর্গ প্রকৃতিকে এদেশের সোনার মতো মানুষগুলোকে। তিতুমীর থেকে শুরু করে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লে. মতিউর রহমান পর্যন্ত তরুণরাই বারবার নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে এদেশকে প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্ত করেছেন। আমরা তাঁদেরই উত্তরসূরী। তবে আমরা সকলে কেন নিজেদের শ্রম, মেধা, প্রতিভাকে উৎসর্গ করতে পারব না এদেশের জন্য? কবির আহ্বান- " তবে উঠে এস যদি থাকে প্রাণ তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান"। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে তৃতীয় বিশ্বের মেধা ব্যাপকভাবে পাচার হয়। যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। কিন্তু এদেশের তরুণরাই তো পারে সাময়িক সেই সব সুখ, ভোগ বিলাস ত্যাগ করে মাতৃভূমি বাংলার জন্য কিছু করতে। সকল প্রকার স্বার্থ, দুর্নীতি, লোভ লালসার উর্ধ্বে থেকে, নিজেদের যোগ্য, প্রতিষ্ঠিত মানুষরূপে গড়ে তুলে বিশ্বকে চমক দেখাতে পারে বাংলার তরুণরাই। শুধু প্রয়োজন ইচ্ছাশক্তি আর সাধনা। সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আমাদের কম প্রাচুর্য দেন নি। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক, খনিজ, বনজ, জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারতাম। আমাদের শুধু অভাব সদিচ্ছার। আর মীরজাফররূপী গুটিকতক স্বার্থান্বেষী, অর্থালোভী, কুচক্রী লোকের দুর্নীতি, সন্ত্রাস, কালো টাকা, ষড়যন্ত্র ও স্বার্থলিপ্সা আমাদেরকে নিস্তেজ করে দিয়েছে। তাই নবজীবনের জয়গান গেয়ে, দেশমাতৃকাকে ভালোবেসে, সহজ-সরল মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আজ আমাদের অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য হোক- সকল অন্যায় থেকে দূরে সরে মানুষ, সমাজ, দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য হাতে হাত রেখে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা। মানুষকে ভালোবাসা, দেশের কল্যাণে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া। আমি যে দিন জন্মেছিলাম সেদিন সবাই হেসেছিল, আমি কেঁদেছিলাম। সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কাছে আমাদের এই আকুল প্রার্থনা- হে দয়াময়, যেদিন আমি মারা যাবো, সেদিন যেন পৃথিবী থেকে হাসতে হাসতে বিদায় নিতে পারি। আর সকলের হৃদয়ে যেন সারা জীবনের জন্য বেঁচে থাকতে পারি।

ভিনদেশের কথকতা

দীপেশ দেওয়ান
কলেজ নম্বর : ৯৫৪০
শ্রেণী : দ্বাদশ

শুরুর কথা :

মানুষ স্বভাবতই ভ্রমণপ্রিয়। প্রাত্যহিক জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে ভ্রমণের জুড়ি নেই। বিদেশ ভ্রমণের মজা আরো বেশি। আনন্দের পাশাপাশি অন্য দেশের প্রকৃতি, মানুষ, তাদের সংস্কৃতির সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এর মাধ্যমে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আয়োজিত আন্তঃস্কুল কুইজ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মাধ্যমে আমি, মাহাদী আর শাফকাত মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর ভ্রমণের সুযোগ পাই। ৮ মে রাতে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে আমরা রওনা দিই, আমাদের সাথে ছিল রানার্স আপ দলের তিনজন ছাত্র (আরমানিটোলা গভঃ বয়েজ হাই স্কুল) আর একাডেমি সংশ্লিষ্ট তিনজন কর্মকর্তা। প্রথম বিদেশ ভ্রমণ বলে আমাদের (ছাত্রদের) উত্তেজনার শেষ ছিল না।

মালয়েশিয়ার মায়ায়

৯ মে সকালে আমরা পৌছলাম মাহাথির মোহাম্মদের দেশ মালয়েশিয়ায়। বিমানবন্দরের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর প্রতিকৃতিগুলো বলে দেয় সেখানে তাঁকে কী পরিমাণ শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। মুগ্ধতার শুরু বিমানবন্দর থেকেই। রাস্তার দু'পাশে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত পাম গাছের সারি, মাঝে মাঝে ঘরবাড়ি আর সৌন্দর্যবর্ধক কিছু ভাস্কর্যও চোখে পড়ে-সবই সুন্দর। দেখলেই মন জুড়িয়ে যায়। প্রায় ২ ঘণ্টা পর পর্যটন এলাকা 'চাঙ্খাত বুকিত বিনতাং' আমাদের স্বাগত জানাল। সেখানে উঠলাম Hotel Radius International এ। আমার রুমের বিশাল জানালা দিয়ে পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার সম্পূর্ণ চোখে পড়ে, যেন একটা ছবি। বিকালে গেলাম এলাকাটা ঘুরতে। পুরো এলাকায় বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের ছড়াছড়ি, মেলা বললে ভুল হবে না। মার্কেটগুলোতে অনেক ভিড়, বিশেষত বিবি প্লাজায়। বাংলাদেশি আর ভারতীয় বিক্রেতাও কম নয়, তাদের সাথে কথা হল। হেঁটেই ঘুরলাম চারপাশ, পাশাপাশি চলল কেনাকাটা। প্রথম দিনটা আনন্দে কাটলো।

পরদিন আমাদের গন্তব্য গ্যান্টিং হাইল্যান্ড, সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত বিখ্যাত পর্যটন আকর্ষণ। পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে উপরে যত উঠতে লাগলাম ঠাণ্ডা তত জাঁকিয়ে বসল। একেবারে উপরে পৌছতে অন্যরকম অনুভূতি, থিমপার্ক থেকে শুরু করে পাঁচতারা হোটেল-কী নেই এখানে! রাইডগুলোর তুলনা হয় না, অনেক মজা করলাম সবাই মিলে। রোপওয়েতে চড়ার ইচ্ছা থাকলেও বৈরী আবহাওয়ার কারণে তা সম্ভব হল না। ফেরার পথে বৃষ্টি নামল। বিকাল হয়ে গিয়েছিল, সবাই ক্লান্ত। সন্ধ্যাটা হোটেলে কাটালাম।

তৃতীয় দিন সকালে গেলাম মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে, কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করতে। মজার ব্যাপার , সেখানে কর্মরত ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব ইয়াজদেনি আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। নিজেই পরিচয় দিলেন, স্যার-ম্যাডামদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। হাইকমিশন থেকে সরাসরি পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার চলে গেলাম। সত্যি মালয়েশিয়ানরা এটা নিয়ে গর্ব করতে পারে। মাথা উঁচু করে দুই যমজ সন্তান যেন মালয়েশিয়ার সমৃদ্ধিকে তুলে ধরেছে। ৪৫৩ মিটার উঁচু আকাশ ছোঁয়া এ স্থাপনার যে কতটা গুরুত্ব আর আকর্ষণ বহন করে তা বিপুল পর্যটক সমাগম থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না।

তিনদিনের মালয়েশিয়া ভ্রমণ শেষ, মনটা কিছুটা খারাপ হয়ে গেল। মালয়েশিয়াকে কেন 'টুনি এশিয়া' বলা হয় তা কিছুটা হলেও আন্দাজ করলাম এ তিনদিনে। মালয়েশিয়ার মায়াকে বিদায় জানিয়ে আমরা উড়াল দিলাম সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে।

স্বপ্নের দেশ সিঙ্গাপুরে

ছোট দেশ হলেও সিঙ্গাপুর খুবই উন্নত, এর প্রমাণ মেলে চাঙ্গি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকেই। সুবিশাল এয়ারপোর্টের অত্যাধুনিক সজ্জার প্রশংসা না করে পারা যায় না। ২০০৬ সালে এটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এয়ারপোর্টের স্বীকৃতি পায়, নির্বাচন ভুল হয় নি। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল যাওয়ার পথে যা কিছু চোখে পড়ল সবকিছুতেই পরিচ্ছন্নতা আর সুপরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট । Hotel Royals-এ পৌঁছতে প্রায় দেড় ঘন্টা লাগলো। সিঙ্গাপুরের মার্কেটগুলোতে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি। সুপরিচিত মার্কেটের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য Mostafa Plaza, পর্যটকরা এ মার্কেটে আসতে কখনো ভোলেন না। 'ঈকিয়া' নামের একটি মার্কেটে ভিড় অনেক বেশি, নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছু এখানে পাওয়া যায়। জিনিসপত্রের বৈচিত্র্যই ক্রেতাদের আকর্ষণ করে সন্দেহ নেই। সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ Sentosa Island। বিনোদনের নানা উপাদানে পরিপূর্ণ এ দ্বীপ। রোপওয়ে, বাস কিংবা বোট -যেকোন মাধ্যমে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে, আমরা বেছে নিলাম বাস। এখানে গেলাম Underwater World-এ । কাচঘেরা জায়গার মধ্য দিয়ে হাঁটছি, কাঁচের বাইরে সমুদ্রের মাছেরা এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে। দেখা হল বিশ্বখ্যাত Laser Light Show, সমুদ্রের রাজকন্যা 'পার্লকে' পাওয়ার জন্য এক রাজকুমার 'কিকি' অদ্ভুত যেসব আজ করে তা-ই দেখানো হয় আধঘন্টার এই Show -তে । মিউজিকের তালে তালে পানির ফোয়ারার নৃত্য, তার সাথে রঙিন আলোর খেলা দেখে যে কেউ মুগ্ধ হতে বাধ্য। মন কেড়ে নেয়া Musical Program-ও বাদ পড়ল না। সিঙ্গাপুরে মজা লেগেছিল পাতাল রেলে চড়ে। টিকেট কাটা থেকে সবকিছু স্বয়ংক্রিয়, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই।

সিঙ্গাপুরে আমরা তিনদিন ছিলাম। সময়ের স্বল্পতার কারণে আরো কিছু আকর্ষণীয় জায়গা ঘুরতে পারি নি। ১৫মে সন্ধ্যার ফ্লাইটে আমরা রওনা দিই বাংলাদেশের উদ্দেশে।

ছয় দিনের ভ্রমণে আমরা আনন্দ করেছি অনেক; সাথে কিছু শিখেছি, জেনেছি। ফ্রেমে বন্দী ছবিতে যতটা স্মৃতি থাকবে তার চেয়ে বেশি থাকবে মনে। প্রথম বিদেশ ভ্রমণের কথা নিশ্চয় কেউ ভুলতে পারে না।

অনুশোচনা

রুমানা আফরোজ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

রুমু ও সুমু দু'বোন। ওদের বাবা ওদের ছেড়ে যখন চলে যায় তখন সুমুর বয়স চার বছর আর রুমুর আট বছর। বাবা চেয়েছিল রুমুর একটা ভাই হোক। কিন্তু মা আর ঝুঁকি নেয়নি। কারণ বাবা রুমু-সুমুরই ঠিকমত দেখাশোনা করতো না। সংসারের সমস্ত খরচ যোগাতো মা। তার উপর রাত-দুপুরে নেশা করে এসে বাবা মাকে মারধর করত। মাস শেষে মায়ের মাইনে থেকে ভাগ চাইতেও দ্বিধা করতো না। অবশেষে একদিন ঘটনার চূড়ান্ত পর্যায়ে ওদের বাবা মাকে ছেড়ে চলে যায়। বাবা আরেকটা বিয়ে করে দিব্যি সংসার করতে থাকে তার স্বভাবসুলভ ভাবে। এদিকে মা অনেক কষ্ট করে রুমু-সুমুকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে তুলতে থাকে। রুমু-সুমু শুধু লেখাপড়ায় নয় গান, কবিতা আবৃত্তি, নাচ, ছবি আঁকা, অভিনয়, খেলাধুলা সবকিছুতেই পারদর্শী হয়ে উঠতে থাকে। মায়ের বুকভরা আশা চোখ ভরা স্বপ্ন। দিন পেরিয়ে যায় একে একে। মেঘে মেঘে কেটে যায় অনেক বেলা। রুমু-সুমু বড় হয়ে ওঠে। রুমু আজ স্বনামধন্য ডাক্তার আর সুমু হয়েছে একজন নামকরা জজ। মায়ের এতদিনের সব কষ্ট সার্থক।

একদিনের কথা। রুমু হাসপাতালে ডিউটি করছিল। হঠাৎ করেই এক রোগী আসে। ভীষণ অসুস্থ। রুমুর কাছে রোগীকে খুব পরিচিত মনে হয়। হঠাৎ করেই মনে পড়ে যায় রুমুর, এতো তার বাবার দ্বিতীয়া স্ত্রী। রুমু ক্ষণিকের জন্য আবেগপ্রবণ হলেও সামলে নেয় নিজেকে। মনে পড়ে মায়ের দেয়া শিক্ষার কথা। প্রাণপণ চেষ্টায় রুমু তাকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনে।

অন্যদিকে আদালতে চলছে সুমুর বিচারকার্য। অপরাধীকে দেখে চমকে ওঠে সুমু। এ কি! এ যে তার সেই নিষ্ঠুর পিতা! কিছুক্ষণের জন্য সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে সে। হঠাৎ করেই মনে পড়ে মায়ের কথা। মায়ের শিক্ষা। সুমু শেষ পর্যন্ত আসামীকে অফিস থেকে টাকা চুরির দায়ে ৫ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে। জেলে ঢোকার পর বাবার সঙ্গে সুমু দেখা করে। সুমুকে বাবা চিনতে পারে নি। যখন চিনতে পারে তখন তার অশ্রু আর বাঁধ মানে না, সন্তানের কাছে ক্ষমা চায় সে।

রুমু যখন রোগীকে পরদিন দেখতে যায় দেখে সেই ভদ্রমহিলার পাশে বখাটে ধরনের এক ছেলে বসে আছে। দূর থেকে রুমু ফলো করে তাকে, দেখে ছেলেটি মায়ের এই অবস্থায় তার কাছে টাকা চাইছে, আর মা তাকে কটূক্তি করছে নেশা করার জন্য। অনেকক্ষণ পর মা যখন বাধ্য হয়ে তাকে টাকা দিল তখন যাবার সময় সে কেবল বলে গেল যে তার বাবার অফিস থেকে টাকা চুরির দায়ে ৫ বছরের জেল হয়েছে। মা স্তব্ধ হয়ে গেল খবর শুনে এবং হার্ট অ্যাটাক করলো। রুমু পুরো ঘটনাটি দূর থেকে দেখলো এবং চেষ্টা করেও এবার আর তাকে বাঁচাতে পারলো না।

বাড়িতে রুমু-সুমু দুজনেরই মন খারাপ। শত হলেও রক্তের টান। মানুষটাকে ঘৃণা করতে গিয়েও তারা কেন যেন ঘৃণা করতে পারে না। মা বলেছিল, যা হয়েছে আমার সঙ্গে, তোমরা কেন তাকে ঘৃণা করবে। বোধ হয় এ অযৌক্তিক কথার বীজই ডালপালা ছড়িয়েছে তাদের মনে। মায়ের নিঃসঙ্গতা তাদের কষ্ট দেয়।

রুমু-সুমু অনেক বড় একটা সিদ্ধান্ত নেয়। বাবার সঙ্গে তারা দেখা করবে, কথা বলবে। বাবা তাদের দেখে, সব কথা শুনে অঝোরে কাঁদতে থাকে। দু'হাত জোড় করে মেয়েদের কাছে ক্ষমা চায় সে। তাদের এতগুলো বছর হয়ত সে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, কিন্তু স্ত্রীর জীবনের শেষ দিনগুলো হয়তো ভরিয়ে দিতে পারবে আকাঙ্ক্ষিত সেই হাসি, আনন্দ আর ভালবাসায়। সে বুঝতে পারে সুসন্তান সে মেয়ে কিংবা ছেলে যাই হোক জীবনে আসে আশীর্বাদস্বরূপ, আর কুসন্তান বয়ে নিয়ে আসে অভিশাপ।

বাউল সম্রাট লালন শাহ্ : জীবন ও কীর্তি

মুহম্মদ হায়দার আলী
সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ

বাউল গানের অবিস্মরণীয় প্রতিভা লালন শাহ্। তাঁর জীবন ও কীর্তি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। অসামান্য প্রতিভাগুণে লালন তাঁর গানে বাউল তত্ত্ব ও বাউল সাধনার বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতিকে অনুপম শিল্পব্যঞ্জনা দান করেছেন। ধর্মদৃষ্টিতে অধ্যাত্মবাদী হলেও তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মহান পুরুষ।

লালন শাহের জন্মপরিচয় রহস্যাবৃত, দ্বন্দ্বজটিল ও অমীমাংসিত। গবেষক মহলের অভিমত যে, তিনি ১৭৭৫ সালে বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থানার অন্তর্গত আড়াড়া গ্রামে এক হিন্দু কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯২ সালে ১১৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। লালন শাহ্ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেন নি। প্রকৃতি ও মানব সমাজ থেকে জ্ঞান আহরণ করে তিনি স্বশিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। লালন তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হন। পরে জনৈক মুসলমান দম্পতি আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষায় তাঁকে বাঁচিয়ে তোলেন। স্বদেশে ফিরলে তাঁর জন্য হিন্দু সমাজের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। বর্ণবিভাজিত হিন্দু সমাজে তিনি অশুচি বলে ঘৃণিত ও পরিত্যাজ্য হন। তখন তিনি ফকিরী ধর্ম গ্রহণ করে 'লালন শাহ ফকির' নামে পরিচিত হন। মুসলিম সম্প্রদায়ের জনৈকা নারীকে বিয়ে করে লালন ছেঁউরিয়া গ্রামে আশ্রম নির্মাণ করেন এবং বাউল ও ফকিরী সাধনভজন করতে থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে অনেকেই মনে করেন।

জীবনদৃষ্টি ও মতাদর্শে লালন শাহ্ ছিলেন উদারনৈতিক অধ্যাত্মবাদী। তিনি আত্মসাধনার মধ্যে দিয়ে মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেছিলেন। তাই হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাঁর শিষ্য হয়েছিল। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে মানবতাবাদী আদর্শের চর্চা করেছিলেন। তাঁর গানে যেমন হিন্দু মনোভাবদ্যোতক অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি সুফী ধর্মানুমোদিত পারিভাষিক শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে প্রচুর। সীমা-অসীম বা জীবাত্মা- পরমাত্মার সম্পর্ক তিনি অভিব্যক্ত করেছেন অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে। কিন্তু তত্ত্বকথাও তাঁর ভাষায় অসামান্য কাব্যশ্রী লাভ করেছে। সর্বোপরি আধুনিক মনের সঙ্গে তাঁর গানগুলোর গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক সুলক্ষ। এজন্য তিনি সহজেই রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন এবং আধুনিক শিক্ষিত সমাজে লাভ করেছেন অমরত্ব।

নিজেকে জানার সাধনা বাউল সাধনার মূলকথা। মহান প্রভু প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিরাজ করেন। কিন্তু তাঁকে কেউ ধরতে পারেন না, দেখতে পারেন না। অন্তরবাসী এ পরমাত্মাকে লাভ করা যায় কেবল আত্মসাধনায়। বাউল সাধনার এ তত্ত্বকথাই নানাভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে লালন শাহের গানে। তাঁর একটি বিখ্যাত গানের প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি লক্ষণীয় :

" আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
তারে জনম ভর একবার দেখলাম না রে।।
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে,
দেখতে পাই নে ঐ নয়নে,
হাতের কাছে যার ভাবের হাট-বাজার,
ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।।"

মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য বাইরে অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই, নিজের ভেতরেই পেতে হবে তাঁর সন্ধান। পরমাত্মা অন্তরের মধ্যে অবস্থান করে চুপিসারে শোনে সব কথা। তবে তিনি জল না আগুন, মাটি না বাতাস তার স্বরূপ নির্ণয় করে কেউ বলতে পারে না। লালনের ভাষায় :

" আপন ঘরের খবর হয় না,
বাঞ্ছা করি পরকে চেনা,
লালন বলে পর,পর কি পরমেশ্বর,
সে কেমন রূপ, আমি কিরূপ ও রে।"

স্রষ্টা হৃদয়বাসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মানুষের কাছে অদৃশ্য ও রহস্যময়। তিনি নিরাকার। তাঁর হাত-পা-স্কন্ধ-মাথা কিছু নেই। স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রয়োজন কায়াসাধনা। লালনের গানে স্রষ্টার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এভাবে :

" কি কব সেই পড়শীর কথা
ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা নাই রে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।"

মানুষ স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য পৃথিবীময় পরিভ্রমণ করে। কিন্তু স্রষ্টা অবস্থান করেন মানুষের ভেতরেই। তাই তাঁকে পাওয়ার জন্য বাইরের জগতে বিচরণ করার প্রয়োজন নেই। অন্তরের মধ্যেই খুঁজতে হবে তাঁকে। আত্মসাধনাই স্রষ্টাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এজন্য লালন বলেছেন :

" ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়।
আপন ঘর না বুঝে
বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধায়।।"

লালন শাহ্ পরমাত্মাকে চিহ্নিত করেছেন নানা নামে, বিভিন্ন প্রতীকে ও বিমূর্ত স্বরূপে। তিনি স্রষ্টাকে বলেছেন 'প্রাণপাখি', 'মনের মানুষ', 'মানুষ রতন', 'অচিন পাখি' 'সোনা মানুষ' ইত্যাদি। লালন শাহ্ পরম স্রষ্টাকে চিনতে না পেরে হাহাকার করেছেন। স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের সাধনায় একনিষ্ঠ থেকেও তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন :

"এই মানুষে আছে রে মন,
যারে বলে মানুষ-রতন,
লালন বলে, পেয়ে সে ধন
পারলাম না রে চিনিতে।। "

মানুষের ভেতরে স্রষ্টার অবস্থান রহস্যময়। তিনি হৃদয়ের অন্তস্তলে অবস্থান করেন আয়নার মতো স্বচ্ছ গৃহে। পরমাত্মা খাঁচারূপ মানবহৃদয়ে সর্বদাই আসা-যাওয়া করেন। তাঁকে ধরা যায় না কোনোমতেই। লালন বলেছেন, অচিন পাখিরূপী পরমাত্মাকে যদি তিনি ধরতে পারতেন, তবে তাঁর পায়ে পরিয়ে দিতেন 'মন-বেড়ী'। লালন শাহের একটি বিখ্যাত গানে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে তাঁর এ আক্ষেপ ও আকাঙ্ক্ষার কথা :

" খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।।
আট-কুঠরী নয় দরজা আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা,
তার উপর আছে সদর কোঠা-
আয়না মহল তায়।।"

লালন শাহ্ ছিলেন মুক্তবুদ্ধির অধিকারী। তাই তিনি নিজেকে কখনো কোনো জাত-ধর্মের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। সকল ধর্মের মানুষের প্রতিই ছিল তাঁর সমান শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তবু অনেকেই তাঁর জাতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে। এর উত্তরে লালন বলেছেন :

" সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয়, জাতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে।।
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী-লোকের কি হয় বিধান ?
বামন চিনি পৈতার প্রমাণ
বামনী চিনি কি ধরে।।"

লালন বলেছেন- মহান স্রষ্টার কাছে জাতিভেদ নেই; ভক্তির দ্বারাই নিরূপিত হয় জাতিভেদ। লালনের একটি গানে একথা ব্যঞ্জিত হয়েছে স্পষ্টভাবে :

" ভক্তির দ্বারা রাখা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে
তার কাছে জাতের বিচার নাই।।"

প্রকৃতপক্ষে লালন শাহ্ ছিলেন উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ বাউল কবি ও সাধক। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই স্রষ্টাপ্রেমিক ও উদারনৈতিক মানবতাবাদী শিল্পী। তাঁর রচিত গানে যেমন আন্তরিকতা, বিনম্রতা ও স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করতে না পারার কারুণ্য আছে, তেমনি আছে উচ্চাঙ্গের ধ্বনিমাধুর্য ও সুরমূর্ছনা। তাঁর আগে ও পরে অনেক বাউল কবির আবির্ভাব ঘটেছিল, কিন্তু লালন শাহের কবিত্ব, ভক্তি ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। আপন প্রতিভাগুণেই লালন শাহ্ লাভ করেছেন কালোত্তীর্ণ মহিমা।

বাংলাদেশের দ্বীপ ভোলা : সিডর এবং আমার ভাবনা

রওশন আরা বেগম
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

১৯৪১ সালের মে মাস। ভোলা জেলার উপর দিয়ে বয়ে যায় এক প্রলয়ংকরী ঝড়। ২৫শে মে বিকেল থেকে বৃষ্টি এবং মাঝ রাতের দিকে প্রবল বেগে ঝড় শুরু হয়। বঙ্গোপসাগরের পানি ফুলে উঠে। পরদিন সকাল পর্যন্ত ঝড় চলে। হাজার হাজার মানুষ ও গবাদিপশু ভেসে যায়। ঝড়ের অনেক পরে দুর্যোগের খবর এসে পৌঁছায়। সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা অবশ্য দেখানো হয় তিন হাজারের কাছাকছি। ঐ রাতে বোরহান উদ্দীন থানাধীন ছোট মানিকায় তালুকদার বাড়ির লোকজন জলোচ্ছ্বাসের ভয়ে আরো নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। গভীর রাতে প্রায় ৩০/৪০ জনের দলটি প্রচণ্ড বাতাস ও বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির সামনের ভাঙা সাঁকো পার হয়ে সদর রাস্তা দিয়ে মিয়া বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। ঐ বাড়ি যেতে আধা মাইল রাস্তা পার হতে হয়। চারদিক অন্ধকার, বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়েছে। বিজলীর প্রচণ্ড ঝলকানি, প্রবল বাতাস। সে এক ভয়ংকর অবস্থা। তখন আমার মায়ের বয়স হয়তো নয়-দশ বছর। দেখতে পাতলা ছিলেন। কাফেলার যাত্রীর মধ্য হতে সোনার মা (কলকাতার নানী) চিৎকার দিয়ে উঠলেন " ওরে শুইনেছিস ফকুকে ধর, ও যে পাতলা বাতাসে উড়িয়ে যাবেনে।"

১৯৬৮ সালের জুন মাস। অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। আমরা বেড়াতে গিয়েছি দাদার বাড়ি ভোলার উজিরপুরে। তারিখটা আজ আর মনে নেই। সকাল হতেই বৃষ্টি শুরু হয়। বাতাস ছিল অল্প অল্প। এভাবে দুই দিন চলার পর তৃতীয় দিনে বাতাসের গতিবেগ প্রচণ্ড বেড়ে গেল। তখন তো গ্রামে কারেন্ট ছিল না। গ্রামের বাড়িতে তেমন কেউ অত গুরুত্ব দিয়ে রেডিও শুনত না। সম্ভবত রাত ১১/১২ টা হবে। চারদিকে অন্ধকার। প্রচণ্ড বাতাস। মনে হচ্ছিল গভীর অন্ধকারে পৃথিবী তলিয়ে যাচ্ছে। ঝড় শুরু হলো। ঝড়ের তাণ্ডবে ভয়াবহ অবস্থা । আমাদের দাদার বাড়ির চারিদিকে শুধু নারিকেল-সুপারির বাগান। সে কি বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ। সে এক ভয়ংকর শব্দ। টিনের বিশাল বাড়ি। মনে হচ্ছে টিনের চাল এই বুঝি উড়ে গেল। যৌথ পরিবার আমরা। সব কয়টি চাচাতো ভাই-বোন একসাথে বসে শুধু কাঁপতে লাগলাম। আমার মা জোরে জোরে দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন। আমার চাচীরা জিনিসপত্র সব সামলাতে লাগলেন। এক পর্যায়ে বাতাসের গতিবেগ প্রচণ্ড বেড়ে গেল। মা-চাচীরা সিদ্ধান্ত নিলেন উত্তর ভিটার ছোট পাকা ঘরটায় যাবে। কারণ ঐ ঘরটা কিছুদিন আগে তৈরী করা হয়েছিল। নতুন বলে মজবুত। সবাই সেখানে যেতে শুরু করল। উঠান পার হয়ে আমরাও যাচ্ছি। আমি ছোট বেলায় খুব পাতলা ছিলাম। হঠাৎ পেছন হতে বড় চাচী বলল " অরে ধর, অয় যেই পাতলা, বাতাসে উড়াইয়া যাইবে।" আমাকে বাতাসে উড়িয়ে নেয় নি ঠিকই, কিন্তু ঐ উঠানটুকু পার হতে যে দুর্যোগ আমি দেখেছি তা জীবনে কখনও ভুলতে পারিনি। সেবারেও অনেক ক্ষতি হয়েছিল ভোলার। এবার আরো একটু পেছনের দিকে যাওয়া যাক।

১৭৮৭ সনের প্লাবন ও দুর্ভিক্ষ বরিশালের এক করুণ ইতিহাস। তখন ভোলা ছিল বরিশাল জেলার মহকুমা। মি. ডগলাস বলেছেন, "১৭৮৭ সনের ঝড়ে ভোলা জনশূন্য হয়ে জঙ্গলে পরিণত হয়।" ১৮২২ সনের কোম্পানী শাসনামলে বাকেরগঞ্জে যে প্রলয়ংকরী ঝড় হয়েছিল তাতে চালের মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ক্যালকাটা জার্নালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়, "১৮৬৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে যে ঝড় হয় তাতে ভোলা ৩৬ ফুট পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিল।"

১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসের আঘাতে পোকা মাকড়ের মতো ভেসে গিয়েছিল মানুষ। বঙ্গোপসাগরের স্রোতে বিশাল ঢেউ তাল গাছের উপর দিয়ে এসে তলিয়ে যায় ভোলা। সেবার আমার বাবার ফুফু ভেসে যান। দূরের বহু আত্মীয়-স্বজন হারিয়ে যায়। আমার মনে আছে আমরা তখন ঢাকায়। আগের দিন রাত হতেই ঢাকায়ও হালকা বাতাসসহ বৃষ্টি হচ্ছিল। দক্ষিণাঞ্চলের নদী উত্তাল। বঙ্গোপসাগর ফুলে উঠে। রেডিওতে নৌ বিপদ সংকেত দিচ্ছিল। আমার বাবা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলে বার বার ভোলার খবর শোনার চেষ্টা করছিলেন। তখন মোবাইলের যুগ নয় বলে ত্বরিৎ দেশের খবর নেওয়া খুব কঠিন। সদরঘাট লঞ্চে গিয়ে খবর নিতে হতো। ১২ই নভেম্বর ঘটে গেল মহা প্রলয়ংকরী ঘটনা। পরের দিন সকালে সমস্ত সংবাদ শোনা গেল। আমার বাবা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন।

ঐ সময় দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল অস্থির। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালি স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ। তাই জানুয়ারি মাসে বাবা আমাদের ভোলা পাঠিয়ে দিলেন। যুদ্ধের আশংকা করছিলেন। গিয়ে দেখি ভোলায় হাহাকার। ১২ই নভেম্বর এর তাণ্ডব ভোলাকে নিঃস্ব করে দেয়। অভাব আর অভাব। কোন সরকারি সাহায্য চোখে পড়ে নি। অন্তত আমাদের উদয়পুর গ্রামে তো নয়ই। ১৯৭২ সনের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো। ফেব্রুয়ারি মাসে এসে ঢাকার স্কুলে সরকারি সাহায্য বা রিলিফের মাল চোখে দেখলাম। ক্ষতিগ্রস্ত ভোলার লোক সাহায্য পেল কিনা ঠিক বুঝলাম না। ভোলা জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ। দেখতে কতকটা শশার মত। হিমালয়ের পলিমাটি বাহিত ভোলা বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত। ধান, চাল, সুপারী, নারকেল, মাছ ও রবিশস্য ভরপুর ভোলা। সম্রাট আকবরের সেনাপতি শাহবাজ খাঁর নামানুসারে এর নাম হয় 'শাহবাজপুর'। পরে শোনা যায় খেয়া ঘাটের মাঝি ভোলা গাজী পাটনির নামানুসারে নামকরণ হয় "ভোলা"।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন ভোলার অমোঘ নিয়তি। সর্বনাশা মেঘনা তেঁতুলিয়া ভোলাকে ফি বছর গ্রাস করে। ১৯৭০ সনের ১২ই নভেম্বর ভোলার কয়েক লাখ মানুষের জীবন প্রদীপ নিভে গিয়েছিল।

১৯৯২ সনে আমি ভোলায় আমার দেশের বাড়িতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করি "উদয়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়"। সেই সুবাদে ঘন ঘন ভোলায় যাতায়াত করতে হয় কিছুদিন। ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাস। আমি আমার বাবাসহ স্কুলের কাজে বাড়ি যাই। এপ্রিল মাস। আসার দিন ছিল শুক্রবার। শনিবার কলেজ আছে সেই মোতাবেক রওয়ানা হই। একটু আধটু বৃষ্টি হচ্ছিল। সেটাকে আমরা গুরুত্ব দেই নি। কারণ ভোলার মানুষ অত্যন্ত সাহসী। তিন নম্বর চারনম্বর সিগন্যাল কোন কিছুই নয় তাদের কাছে। যদিও আকাশ মেঘলা ছিল, নদী ছিল বেশ গরম, বাতাসও ছিল। ভোলায় এসে লঞ্চে চড়লাম। রাত ২টা! মেঘলা ছিল, লঞ্চ তখনও চাঁদপুর আসে নি, মেঘনার মাঝখানে লঞ্চ। শুরু হলো প্রচণ্ড বৈশাখী তাণ্ডব, সেকি ভয়ঙ্করী ঝড়। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করানো কঠিন। আমাদের লঞ্চ উথাল পাথাল ঢেউ এর আঘাতে একদম কাত হয়ে ডুবে যাওয়ার জোগাড়। লঞ্চের বয়গুলো চিৎকার করে বলছিল লঞ্চ যেদিকে কাত হয় সেদিকে ভর দিবেন না। তা কি আর হয়। আমরা ছিলাম তিন তলার কেবিনে। আমি দরজা একটু ফাঁক করে দেখতে চেষ্টা করলাম কি হচ্ছে। প্রকৃতি দেখতে আবার আমার খুব ভাল লাগে। ভাবলাম এই ফাঁকে নদীর অবস্থাটা একটু দেখে-নিই। বিজলীর আলোতে যে অবস্থা দেখলাম তা ভয়াবহ। শুধু কালো কালো জীবন্ত মেঘ যেন হা করে গিলতে আসছে লঞ্চটাকে। আমি ভয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু সেকেন্ডের মধ্যে বাতাসের ধাক্কায় দরজা ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম। দরজা টেনে বন্ধ করতে আমার খুব কষ্ট হয়। তা আর নাই বা বললাম। মনে হলো আমাকে কে যেন প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারলো। আমি কাঁপতে শুরু করি। আমার বাবা নির্বিকার। যেন ভয়ের কোন চিহ্নই তার চোখে মুখে নেই। সে কি সাহস!

পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক আল্লাহতালা ছাড়া মানুষের বাঁচার কোন উপায় নেই বলেই বোধহয় আব্বা নির্বিকার ছিলেন। পরদিন কলেজে আসতে আমার দেরী হয়েছিল। কলেজে আসার পর রাশভারী অধ্যক্ষ কায়সার স্যার রাউন্ডে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার স্কুলের খবর কী? ২০০৭ সাল ১৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার। ঢাকার আবহাওয়া ছিল খারাপ। হালকা বাতাস ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যার দিকে বাতাস বাড়তে শুরু করল। আগের দিন থেকেই নৌ বিপদ সংকেত দিচ্ছিল রেডিও টেলিভিশনে। সারাদিনের সংবাদ ছিল ১০ নম্বর মহা বিপদ সংকেত। ঝড়টির নাম 'সিডর'। অর্থ চোখ। ২২০ থেকে ২৪০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসা 'সিডর' উপকূলীয় বলেশ্বর নদী অতিক্রম করে বরগুনা দিয়ে দেশের স্থলসীমায় প্রবেশ করে। ঐ সময় ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রটি ছিল জেলার পাথরঘাটায়। বরগুনার পর পরই ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, মংলা, খুলনা, বাগেরহাট, দুবলার চর, কলাপাড়া হয়ে ঢাকার উপর দিয়ে চলে যায়। 'সিডর' এর তাণ্ডবে দেশের উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এসব এলাকা ঘূর্ণিঝড়ের ছোবলে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ভেসে যায় ঘরবাড়ি, চারিদিকে মানুষের লাশের গন্ধ, হারিয়ে যায় হাজার হাজার গবাদিপশু। ধ্বংসলীলা ছিল ভয়ংকর। শুধু পার্থক্য এটুকু বর্তমান প্রযুক্তির যুগে আগাম সতর্ক নৌ বিপদ সংকেত ১০ নম্বর রেডিও টেলিভিশনে বারবার প্রচার, মোবাইলের কারণে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি ছিল অবর্ণনীয়।

ঐদিন রাত ১১টায় টেলিভিশনের সামনে বসে খবর শুনছি- ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত। আমি চাচাতো ভাইকে ফোন করি। ফোনটা ধরে ভাইয়ের মেয়ে রুনা। আমি উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করি তোরা কেমন আছিস, সাবধানে থাকিস। পানি হবে ২০/২৫ ফুট উঁচু, তোরা আশ্রয় কেন্দ্রে চলে যা। সাহসী রুনা আমাকে বলে- ফুফু ভয় কইরেন না। আমরা ভাল আছি। আমি মোবাইলে শুনতে পাচ্ছি বাতাসের প্রচণ্ড শব্দ, আমি বললাম, অনেক বাতাস অনেক ঝড়ের শব্দ। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ। আমি জিজ্ঞেস করলাম- কিসের শব্দ? রুনা বলল, গাছ পড়ছে।

হঠাৎ ওর চিৎকার ও বলছে- মা, পিয়ারে ধরেন। অরে বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যাইবো, অয় যেই পাতলা।' পিয়া ওর মেয়ে। রুনা বলছিল ফুফু পরে কথা কমু, বাতাস বাইড়া গেছে। শেষের কথাগুলো আর শোনা গেল না । আমি মোবাইল বন্ধ করে কল্পনা করতে লাগলাম। আমার মাকে 'উড়াইয়া লইয়া যাইবো' ১৯৪১ সালে, ১৯৬৮ সালে 'আমারে উড়াইয়া লাইয়া যাইবো'। ২০০৭ সালে আমার ভাইয়ের মেয়েকে 'উড়াইয়া লইয়া যাইবো'। পাঠক, 'কোথায় লইয়া যাইবো' ?

বেঁচে থাকার লড়াইয়ের এই খেলায় গত ১৭৮৭ সনের কোম্পানী শাসনের প্লাবন, ১৮২২ সালের ঝড়, ১৯৪১ বৃটিশ শাসনের ঝড়, ১৯৭০ পাকিস্তান শাসনামলের ঝড়, ২০০৭ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনের মাঝে ঝড়। এত বছর পরও ভোলাসহ উপকূলীয় অঞ্চল অবহেলিত, জীবন দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, হাজার হাজার গবাদিপশু, বাড়িঘর, পুকুরের মাছ, গাছগাছালি এবং মানুষের স্বপ্ন। এর কি কোন প্রতিকার নেই ?

আমি ভাবছি বৈশাখ মাস হতে শুরু হয় ৩ নম্বর সিগন্যাল, জ্যৈষ্ঠে ৫ নম্বর, আবার আষাঢ়ে ৫/৬ নম্বর এবং আশ্বিন-কার্তিকে ৮,৯,১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত। আবার মানুষ ঘুরে দাঁড়াবে, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কাজে যাবে, একবেলা খেয়ে না খেয়ে হয়ত কোলের শিশুটিকে ঘরের উঠোনে কয়েকটি মুড়ি দিয়ে বসিয়ে দিবে কোন এক আকাশী। শুরু করবে আবার নতুন দিন। আবার চুলা জ্বালাবে। দুটো ভাত ফুটাবে। ঘরের পিড়া লেপবে। কাঁথা শুকাতে দিবে, কতো কাজ আকাশীর। আকাশীর পাতলা শরীরটা কি বাতাসে উড়বে ?

আমি ঢাকায় বসে শুনব ১০ নম্বর মহা বিপদসংকেত 'সিডর', হয়তো 'নার্গিস', নয়তো অন্যকিছু। আমি চোখে দেখছি ঘরের হোগলা পাতার বেড়াটা পত পত করে উড়ছে, কেউ কি বলবে ' অরে ধর উড়াইয়া লইয়া যাইবো।'

কী হেরিলাম হৃদয় মেলে

জেহিন বেগম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

'রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরিশনে'- রাজসফরসঙ্গী হয়ে রাজভৃত্য যেমন তীর্থে যায়, আমিও তেমনি কোনো পুণ্যবলে নয়, বাবা-মা গুরুজনের দোয়ায় তীর্থে বা হজ্বে গিয়েছিলাম ২০০৩ সালে। রাজভৃত্যের সঙ্গে আমার মিলটুকু এখানে যে- সে যেমন পুণ্য কী, এতবড় সৌভাগ্যের মাহাত্ম্য কী, কিছুই বোঝে না ; আমিও তেমনি। নেহাত কপালগুণে সেখানে গেলেও পুণ্য সঞ্চয় বলতে গেলে কিছুই করতে পারি নি। শুধু দুচোখ ভরে দেখেছি আল্লাহ্‌র ঘর, নবীর মসজিদ, দেশ- বিদেশের মানুষ, ভিন্ন ভাষা, বিচিত্র পোশাক, ভাষাগত বৈষম্য সত্ত্বেও সহমর্মিতা প্রকাশে কোন বাধা নেই। আমার এই আনন্দ ভ্রমণের কিছু টুকরো স্মৃতি তুলে ধরছি আজ ।

মদীনা শরীফে মসজিদে নববীতে দেখেছি আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দর এক ঝাঁক শিশু। শুক্রবার মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ সপরিবার সড়ক পথে মদীনায় আসে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। তাদেরই শিশু এরা। অনেকটা পিকনিকের আমেজে। ইউরোপিয়ান বাচ্চা এমনকি " Baby's day out " এর সেই অসম্ভব কিউট বেবিও হার মেনে যায় এদের সৌন্দর্যের কাছে ! গোলাপি ফর্সা রঙ, টুকটুকে লাল গাল-ঠোঁট, নীল-কটা-সবুজাভ চোখ, রেশমের মত নরম পাতলা চুল, নিখুঁত নাক-মুখের গঠন। কেউ মায়ের কোলে, কেউ পুশ চেয়ারে, কেউ টলমল করে হাঁটছে, টুইন বেবিও আছে। পেট্রো-ডলারের দেশের অবস্থাপন্ন ঘরের বলে পোশাক-আশাক চলাফেরা নিখুঁত আভিজাত্যমণ্ডিত। মায়েরা ব্যাগে করে জুস, দুধ, নানারকম শিশুখাদ্য নিয়ে এসেছে। সময় সময় খেতে দিচ্ছে মসজিদে নববীর গাম্ভীর্য বা পবিত্রতা এতটুকু ক্ষুণ্ন না করে। আরেকটি জিনিস যা আমাকে অবাক করেছে তা হলো- তাদের অসাধারণ বাকসংযম। ছেলে বাচ্চারা খেলে বেড়াচ্ছে মসজিদের ভেতর, প্রায় নিঃশব্দ। সোনার তৈরী শেলফে রাখা কোরআন শরীফ অবলীলায় এনে মাকে দিচ্ছে, আবার রেখে আসছে- হাত থেকে ফেলে দিচ্ছে না। কখনো আরেক শিশুর সঙ্গে বিরোধ দেখা দিলে মা অনুচ্চ গলায় ডাকছেন- 'মাহাম্মাদ' কিংবা 'আবদাল্লা' (ঐ দুটো নামই শুনতে পেয়েছি একাধিক শিশুর) তারপর দু'জনের মধ্যে মিলমিশ করিয়ে দিচ্ছেন।

হজ্বের সময় মক্কা শরীফে দেখেছি অন্যরকম মধুর দৃশ্য। চারটি সন্তানসহ তরুণ দম্পতি। তিনটি ছেলে একটি মেয়ে। দামী সাদা টার্কিশ টাওয়েল কাপড়ের ইহরাম বাঁধা। বাবা-মার সঙ্গে কাবাঘর তওয়াফ করছে, সাফা-মারওয়াতে সাতপাক দিচ্ছে।

সর্ব কনিষ্ঠের বয়স হবে এক থেকে দেড় বছর। ছোট্ট মানুষের জন্য কষ্টকর এই পরিক্রমণে ক্লান্ত হয়ে যখন সে গোড়ালি উঁচু করে আপত্তি জানিয়েছে (ইহরামের ভেতর তার ডায়পারটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে) তখন পিতা তাকে বুকে তুলে নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আড়াই কি তিন বছরের অগ্রজ প্রতিবাদী হয়ে বাপের কাপড় ধরে টানাটানি শুরু করেছে কোলে চড়ার জন্য।

আধা ইউরোপীয় আধা এশীয় বলে তুর্কিদের চালচলন পোশাকে রয়েছে অন্যরকম স্মার্টনেস। সেবার ৯৩ হাজার তুর্কি হজ্বে আসেন। প্রত্যেকের পরনে ফিকে সবুজাভ ভারি কাপড়ের একই রকম পোশাক। সুযোগ পেলেই কিছু তুর্কি মহিলা মসজিদের ভেতর দফ জাতীয় যন্ত্র বাজিয়ে আল্লাহর গুণকীর্তন করতেন এবং যিকির করতে করতে কেউ কেউ বেহুঁশ হয়ে যেতেন। মহিলা খাদেমরা তখন কাছে দাঁড়িয়ে কঠিন কণ্ঠে 'ইয়াল্লা হাজ্জা, হারাম হারাম' বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেন। আমার তখন শুধু সুফীদের সেই তুর্কিনাচন-ফানাফিল্লাহ-বাকাবিল্লাহ অনুষঙ্গগুলো মনে পড়তো।

অনারব ইরানিদের মধ্যে দেখেছি একরকম বর্ণপ্রীতি। তাদের বিমানের মনোগ্রাম পঙ্খিরাজ ঘোড়া। মহিলাদের পরিধেয় জংলী ছাপার একইরকম আলখেল্লা টাইপ পোশাক। একদিন ইরানি এক মহিলা মসজিদুল হারামে আমার পাশে বসলেন। ওখানে ফর্মালিটির বিশেষ বালাই নেই বলে আমি আস্তে আস্তে মহিলার পোশাকটি নেড়ে চেড়ে দেখতে শুরু করলাম কিভাবে তৈরী। ফুলহাতা গাউন টাইপের পোশাক তার ওপর শাড়ির মত সুদীর্ঘ এক টুকরো ছাপা কাপড় মাথার ওপর থেকে দুই বাহুর নিচ দিয়ে এনে কেউ একত্রে বুকের মাঝখানে গিট দিয়ে রাখেন, কেউ হাতের মুঠোয় ধরে রাখেন। হঠাৎ যেন আমার কানে সুধা বর্ষণ করে মহিলা বলে উঠলেন 'চাদর, চাদর'। বিস্ময়ে হতবাক আমি। (পরে আস্তে আস্তে মনে পড়লো ক্লাসে যে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার পড়াই, চাদর শব্দটি তাহলে এসেছে বিদেশী ফার্সি শব্দ থেকে)।

হারাম শরীফের হাম্মামখানা- সে এক এলাহি কাণ্ড। না-পাক ব্যাপার স্যাপার বলে উভয় হারামে অর্থাৎ মসজিদুল হারাম এবং মসজিদে নববীতে মাটির ওপর কোন হাম্মামখানা নেই। সব আন্ডার গ্রাউন্ডে। তা-ও আবার নিচের দিকে দোতলা। প্রথম তলায় এসকেলেটর এবং সিঁড়ি রয়েছে, দ্বিতীয় তলায় শুধু এসকেলেটর। মক্কা শরীফে আমাদের এক সতীর্থ একদিন মজা করে বললেন, দেশ থেকে আসার সময় কে যেন বলে দিয়েছে 'আবু জেহেলের বাড়ি গেলে একটু 'হিসু' করে এসো'। কিছু বুঝতে পারিনি, পরে শুনলাম মসজিদুল হারামের হাম্মামখানাটি গড়ে উঠেছে ইসলামের ঘোরতর শত্রু আবু জেহেলের বসত ভিটার ওপর। তিনশটি হাম্মাম, দেড়শটি পুরুষদের এবং দেড়শটি মহিলাদের জন্য । এভাবে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাহানের ঘৃণা আবু জেহেলের ওপর বর্ষিত হতে থাকবে।

রওজা মোবারকে মহিলাদের প্রবেশাধিকার অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। প্রতিদিন দুবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা মহিলাদের জন্য খুলে দেয়া হয়। তবে সরাসরি নবীর (স) সমাধির কাছে যাবার হুকুম নেই। একটি অনতিউচ্চ পার্টিশন দিয়ে তা আড়াল করে রাখা হয়। কারণ ইসলামের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষা এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে শিরক করার পাপ থেকে মানুষকে বিশেষত আবেগপ্রবণ মহিলাদের বিরত রাখার জন্য রাসুল (স) কবরপূজা বা কবরস্থানে মহিলাদের যাওয়াকে নিরুৎসাহিত করেছেন। রওজা শরীফের ফটক খুলে দেয়ামাত্রই দেখেছি মহিলারা পড়ি কি মরি করে ভেতরে ঢোকেন। নিঃশব্দে চলাফেরা এবং দোয়া দরুদ পাঠের নির্দেশ থাকলেও পাকিস্তানি মহিলারা মাতম করার ভঙ্গিতে 'মেরে লাল' ইত্যাদি বাৎসল্য প্রকাশক শব্দাবলি উচ্চারণ করতে থাকেন। সোনায় মোড়া বাতি, থাম ইত্যাদি দু'হাতে স্পর্শ করেন, চুমু খান, আর মহিলা খাদেমরা অনুচ্চকণ্ঠে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন - 'ইয়াল্লা বিবি, শিরক শিরক, হারাম হারাম'। আল্লাহ্র একত্ব রক্ষা এবং শিরকের গুনাহ থেকে মানুষকে বাচাঁনোর আরো সযত্ন প্রয়াস লক্ষ করেছি। হজ্বের দিন কয়েক আগে কাবা ঘর ধৌত করা হয়। পবিত্র জমজমের পানি দিয়ে ধোয়ার পর কাবার সাতফুট উঁচু ভিটির ভিতর ধবধবে সাদা কাপড় দিয়ে বেহেশতি সুগন্ধি দিয়ে সযত্নে মুছে দেয়া হয়। জুমা'র সময় যে স্বয়ংক্রিয় মিম্বরে দাঁড়িয়ে ইমাম খুৎবা পড়েন সেটিই চালিয়ে নিয়ে কাবার দরজায় লাগানো হয় সিঁড়ি হিসেবে। ধোয়ামোছার পর পাকিস্তানি মহিলাদের দেখেছি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে কাকুতি মিনতি করতে ঐ ভেজা বস্ত্র খণ্ডের একটুখানি পাবার জন্য ; এতে নাকি রোগ বালাই সারে। কিন্তু তাঁরা অটল, বলেছেন- ' আল্লাহ্কে বলো। তিনি রোগ সারিয়ে দেবেন। এই জড় বস্ত্রখণ্ডের কোন ক্ষমতা নেই রোগ সারানোর। এটা করা শিরক, পাপ' ।

মদীনা শরীফে জান্নাতুল বাকি গোরস্থানে দেখেছি বাংলাদেশি মহিলারা সেখানকার ধুলাবালি আনতে চাইছেন। এতে নাকি বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী হয়। কিন্তু ভেতরে যাবার উপায় নেই বলে কবুতরকে দেয়া গম ঝাঁট দেয় যেসব বাংলাদেশি ক্লিনার তাদের অনুরোধ উপরোধ করছেন একমুঠো ধুলার জন্য। কিন্তু তারা বার বার অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, বলছে চাকরি থাকবে না। এটা শিরক, (আল্লাহ্র সঙ্গে অংশীবাদ)।

এক অশ্রুতপূর্ব কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম মসজিদুন নববীতে। ফজর এবং মাগরিবের নামায পড়াতেন তিনি, সম্ভবত আযানও দিতেন। অলৌকিক সে কণ্ঠ ! ব্যাখ্যা করার মত ভাষা আমার ঝুলিতে নেই। গম্ভীর, ভরাট অনুচ্চ কণ্ঠের সেই কালাম পাঠ। পিনপতন স্তব্ধতার মাঝে সারা মসজিদে এক অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সবুজ মখমলের মত মসৃণ চিত্ত প্রশান্তিকর সে কণ্ঠ ! আবার হজ্বের সময় মসজিদুল হারামে নামাযের সময় সুরা ফাতেহা পাঠ শেষ হলেই লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ এক সঙ্গে যখন 'আমিন' বলে ওঠে, সেই মন্দ্র গম্ভীর বুলন্দ আওয়াজ কী অনুভূতির সৃষ্টি করে বলা দুষ্কর।

নবীর মসজিদের নির্মিতি অপেক্ষাকৃত নতুন বলেই হয়তো এর স্থাপত্য শৈলী এবং সজ্জাকরণের সর্বত্র এক অসাধারণ হারমনি বা ঐক্য। প্রবেশদ্বারগুলো বিশাল এবং ভারি। সোনার পাতের ওপর কারুকাজ করা হাতল, হুড়কো, কড়া সবই বিশাল এবং ভারি। সোনার ঝাড়বাতি, দরজা, খিলানের নক্‌শা, রঙের বিন্যাস, মার্বেল পাথরের গম্বুজে ফিরোজা রঙের আরবীয় লতাপাতার নকশা- সর্বত্রই উন্নত মার্জিত রুচির ছাপ। মেঝেতে দামী পুরু লাল কার্পেট, মাঝখানে সৌদি মনোগ্রাম-ক্রস করা দুই তরবারির মাঝে খেজুরগাছ। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরই কর্মীরা জীবাণুনাশক দিয়ে ফ্লোর মুছছে, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে কার্পেট পরিষ্কার করছে। একদিন পরিষ্কারের পর অসাধারণ স্বর্গীয় সুগন্ধি স্প্রে করতে দেখেছি। মনে হয়েছে বেহেশতি মেশ্‌ক্‌ আম্বরের সৌরভ বুঝি এমনই। মসজিদের ওপর যে সাদা গম্বুজগুলো দেখা যায়, সেগুলোর ভেতরের দিকে বাদামী কাঠের ওপর সোনালি ফুল লতাপাতার অসম্ভব সুন্দর নকশা। ঠিক গোধূলি বেলায় মাগরিবের নামাযের পূর্বক্ষণে গম্বুজগুলো ধীরে ধীরে সরে যায়। জেগে ওঠে নীল আকাশ। এদের নির্মাণ সৌকর্য এত সুন্দর যে, গম্বুজটি সরে যাবার পর সেই শূন্য জায়গায় কখনো কিছু ছিল এমনটি মনে হয় না। মসজিদের একটি তোরণের নাম 'বাব-এ-আলি-ইবনে-আবু তালিব'। অবাক হয়ে ভাবলাম কী অদ্ভুতভাবে আলির (রা) পিতৃ পরিচয় হিসেবে নবী করিম (স) এর প্রিয় পিতৃব্য অমুসলিম (?) হযরত আবু তালিবের নামটি এসে গেছে !

রওজা মোবারকের একপাশে পাশাপাশি তিনটি জাফরি কাটা সোনার দরজা। একটিতে হযরত ওমর ফারুক (রা) এর কবর, একটিতে মা ফাতেমার (রা) হুজরাখানা (কবর নয়)। দরজায় সোনার হুড়কো। জাফরির ভেতর দিয়ে উঁকি দিলে যেন দু একটি তৈজসও চোখে পড়ে। তৃতীয় দরজাটির ভেতরের জায়গা খালি। হযরত ঈসা (আ) যখন পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন নিজে নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইসলাম কবুল করে উম্মতে মোহাম্মদীর কাতারভুক্ত হবেন। তাঁরই কবরের জন্য এই জায়গাটুকু খালি রাখা হয়েছে।

পৃথিবীর আদি মসজিদ 'বায়তুল্লাহ' বা কাবা শরীফ দৈর্ঘ্য প্রস্থে মাত্র ৪০×৪২ । নামাজের জন্য এখানে স্থান সংকুলান সম্ভব নয় বলেই পবিত্র কাবা শরীফকে বেষ্টন করে গ্যালারির মত নির্মিত হয়েছে পবিত্র মসজিদ-উল-হারাম। সময়ের প্রয়োজনে মসজিদটির কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। যার ফলে এটি গোল লম্বা ডিম্বাকৃতি ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ না হয়ে হয়েছে বহু কৌণিক। এজন্য অভ্যন্তরীণ সজ্জাকরণ, কালার কম্বিনেশন, ঝাড়বাতি ইত্যাদিতে এসেছে দৃষ্টিগ্রাহ্য পার্থক্য। যা কালের সাক্ষ্য দিচ্ছে। যেমন ১নং গেট বাব-এ-আব্দুল-আজিজ দিয়ে প্রবেশ করলে যে স্থাপত্যশৈলী চোখে পড়ে, তার সঙ্গে ৮২ নং গেট দিয়ে প্রবেশ করা অংশের অনেক অমিল। কারণ শেষোক্তটি অপেক্ষাকৃত নতুন নির্মিতি - সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু 'এহ বাহ্য'।

কাবাঘর খালি পায়ে তওয়াফ করতে হয়। বিশেষ এক ধরনের মার্বেল পাথর দিয়ে মাতিফ বা তওয়াফের খোলা চত্বরটি মোড়ানো, যা সৌদি আরবের প্রচণ্ড দ্বিপ্রাহরিক রোদেও থাকে বিস্ময়কর রকম ঠাণ্ডা। কালো গিলাফে ঢাকা কাবাঘর সম্পূর্ণ নিরাভরণ। কঠিন গ্রানাইট পাথরে তৈরি। চাকচিক্যহীন, জৌলুসহীন। প্রখ্যাত ইহুদী পণ্ডিত, পরবর্তীতে ধর্মান্তরিত মুসলিম মনীষী লিওপোল্ড ওয়াইস ওরফে মোহাম্মদ আসাদ তাঁর রুহানী আত্মজীবনী 'দ্য রোড টু মক্কা' বা 'মক্কার পথ' গ্রন্থে প্রথম কাবা শরীফ দর্শনের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এভাবে- বিশাল চত্বরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রায় নিখুঁত কিউব (যা এর আরবি নামের ধাতুগত অর্থ- অর্থাৎ কাবা)। .... কাবাঘরের আদি নির্মাতা (আদম) চেয়েছিলেন আল্লাহর সামনে মানুষের বিনয় ও নম্রতার একটি রূপক তৈরি করতে। একটি কিউবের চরম সরলতায় রেখা-কর্মের সকল সৌন্দর্য বিসর্জনের মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে এই ভাবটি - মানুষ নিজ হাতে যে সৌন্দর্যই সৃষ্টি করুক না কেন, তাকে আল্লাহর জন্য উপযুক্ত ভাবা একেবারেই অর্থহীন আত্মশ্লাঘা।

পবিত্র কাবার ওপর আল্লাহতায়ালা প্রতিদিন ১২০টি নেকী বর্ষণ করেন। যে তওয়াফ করে সে পায় ৬০, যে নফল এবাদত করে সে পায় ৪০, আর যে কিছুই না করে শুধু কাবা শরীফের দিকে চেয়ে বসে থাকে সে পায় ২০। অতি সাধারণ আমি কোন কিছু না করে শুধু কাবার দিকে তাকিয়েই বসে থাকতাম সারাদিন। আর হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যেত এক অপার্থিব ভালোলাগার বন্যায়।

পরিবেশ বান্ধব

কামরুন নাহার খানম
সহকারী অধ্যাপক ও সমন্বয়কারী
(দিবা- জুনিয়র শাখা)

বুদ্ধিমান প্রাণীতে রূপান্তরিত হওয়ার পর থেকে পরিবেশের ওপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করেছে মানুষই। তৃণ বা ফলভোজী প্রাণী থেকে মানুষ হয়েছে সর্বভুক। নিত্য নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ দখল ও নিয়ন্ত্রণে নিতে চেয়েছে সবকিছু, জয় করতে চেয়েছে প্রকৃতিকে। ফলে বিনষ্ট হয়েছে প্রকৃতির ভারসাম্য।

বিজ্ঞানের নব আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সে সম্পদ ব্যবহারের দোষেই আমরা বিপদ ডেকে আনছি এবং সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার আয়োজন করছি। বিজ্ঞানের করুণায় অনেক পেয়েছি আমরা। বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ। আমরা পেয়েছি অফুরন্ত শক্তির সন্ধান। তবে লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ আমাদের এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, আমরা নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। অর্থাৎ অপপ্রয়োগ করছি বিজ্ঞানের।

বিজ্ঞানের সহায়তায় আমরা উদ্ধার করেছি আমাদের অতীত ইতিহাস। জেনেছি একই উৎস থেকে মানব জাতির আগমন। মহাকালের সিঁড়ি বেয়ে আরো উর্ধ্বে আরোহণ করলে দেখতে পাই, একটি বিশেষ জায়গায় প্রাণী ও উদ্ভিদ সব মিলেমিশে একেবারে একাকার হয়ে গেছে। অথচ এই চরম সত্য উপলব্ধি করেও আমরা নানা কুসংস্কারের বেড়াজালে এখনও আবদ্ধ করে রেখেছি নিজেদের। তাই আজও ছাড়তে পারি নি আমাদের অন্ধ সংস্কারগুলো, পরিত্যাগ করতে পারি নি উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি সাদা ও কালোর কৃত্রিম ব্যবধান।

বিজ্ঞান আমাদের জানিয়েছে পৃথিবীতে এককভাবে কারও অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সবার মধ্যেই রয়েছে একটা যোগসূত্র। জীব জগতের সবাই প্রতিবেশী। তাই একের উন্নতি অপরের উন্নতির সহায়ক। একের ধ্বংসে অপরের বিলুপ্তির আশঙ্কা। সত্যটি আবার দেশকালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। এ সম্পর্কে সচেতন নই বলে আমাদের মধ্যে এত হিংসা, বিদ্বেষ, মারামারি ও হানাহানি।

আমরা সবাই প্রতিবেশী ও পরিবেশের দাস। সবার পরিবেশ শুদ্ধ থাকলে আমরাও সুস্থ থাকব। এই হিসেবে মাটিতে বসবাসকারী অতি ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে গাছপালা এমনকি অরণ্যের হিংস্র জন্তু পর্যন্ত সবাই আমাদের প্রতিবেশী। কেননা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরা সবাই সবার ওপর নির্ভরশীল।

সুস্থ দেহ সুন্দর মন। তাই আমাদের পরিবেশ সুস্থ রাখতেই হবে। অপরের উন্নতিতে যত্নবান হতে হবে। এ উদ্দেশ্য সফল করা একক মানুষের অথবা একক কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য জাতিসংঘ থেকে একজন সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলকেই কিছু-না-কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ মুহূর্তে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় সেটি হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। পরিবেশ রূপান্তরের সবচেয়ে বড় ভয় ঐখানেই। ওর দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না কেউই। প্রাণী ও উদ্ভিদের সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবী পরিণত হবে এক তপ্ত মরুভূমিতে। আর সেখানে বিরাজ করবে গর্তবাসী ইঁদুর জাতীয় কিছু কিছু প্রাণী। হয়তো অবস্থা হবে মেসোজোয়িক যুগের শেষ অধ্যায়ের মত।

পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি দেশকে। দেশের অভ্যন্তরেও আরোপ করতে হবে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ। অবাঞ্ছিত ধূলোবালি ও ধোঁয়া, বিবিধ ক্ষতিকর গ্যাস ও আবর্জনা যাতে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে না পারে, পানি দূষিত করতে না পারে, মাটি বিষাক্ত করতে না পারে, তার জন্য কলকারখানা ও গাড়িগুলোর ওপর কঠোর নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে। নিষিদ্ধ করতে হবে খাদ্য ও প্রসাধন সামগ্রীতে রঙের এবং কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতিকর সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার।

এ ব্যাপারে নাগরিকদের সচেতন করার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে। দেশের বিজ্ঞান ক্লাব ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে আরও জোরদার করতে হবে প্রচার। বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় ভালভাবে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলোকে। জনবহুল এলাকায় এবং ট্রেনে, বাসে যাতে কেউ আবর্জনা, পানের পিক, ফলের ছোবড়া, খাদ্যকণা, পোড়া সিগারেট ইত্যাদি ফেলতে না পারে তার জন্য কঠোর আইন বলবৎ করতে হবে।

তবে আইনের দ্বারা সব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। অনেকক্ষেত্রে উল্টো ফলও ফলে। তাই সচেতন হতে হবে জনগণকে। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কৃষকদেরও । তাঁরা যেসব সার ও ঔষুধ ব্যবহার করবেন, সেগুলোর গুণাগুণ ভালভাবে বিচার করে দেখবেন। অথবা কারও কাছ থেকে জেনে নেবেন। যাদের ক্ষতিকর প্রভাব আছে বলে মনে করবেন, তা যত উন্নত হোক না কেন দশের স্বার্থে পরিত্যাগ করার মনোভাব তৈরী করতে হবে। প্রয়োজনে এ ক্ষেত্রেও কঠোর আইন করতে হবে। কারণ প্রকৃতির বন্ধু মানুষই প্রকৃতি ও মানুষের পরম শত্রু।

সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যদি এভাবে পরিবেশ সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়ে তোলা যায় তাহলে পরিবেশ দূষণের ভয়াল রূপ অনেকখানি হ্রাস পেতে পারে। সুন্দর হয়ে উঠবে আমাদের পৃথিবী, সুন্দর হবে তার পানি-মাটি-হাওয়া-আকাশ, আর সুন্দর হয়ে উঠবো আমরাও। আজ বিজ্ঞানের কৃপায় সমগ্র পৃথিবী আমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। দেশ ও কালের গণ্ডি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমরা মানুষ জাতি পৃথিবীরই বাসিন্দা- এই মনোভাব পোষণ করলেই কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে সকল প্রাণীর।

নিজ বাড়ি

ফেরদৌস আরা বেগম
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মা বলেন, 'আমি বাড়ি যাব। আমাদের বাড়ি যাব। আমাকে তোরা এখানে আটকে রেখেছিস কেন?' অথচ মা তো এখানেই আছেন। এখানেই থাকেন। বাবা মারা যাবার পর, ভাই-ভাবী বিদেশ থেকে এসে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করার পর থেকে মা এখানেই থাকেন-ওদের সাথে। আমার ভাই-ভাবী আর ওদের ছেলেমেয়েদের যত্ন, ভালবাসা মাকে ঘিরে। কিন্তু ইদানীং মার একটাই কথা- আমি বাড়ি যাব- আমাদের বাড়ি। ভাই বলে, 'মা, এটাই তো আপনার বাড়ি।' ভাবী বলে-'মা, আমাদের বাড়ি- আপনার বাড়ি তো আলাদা নয়। এটাই তো আমাদের বাড়ি।' মা কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তারপর খুব জোর দিয়ে বলেন- 'না, তোরা আমাকে কী বুঝাতে চাস? আমার বাড়ি আমি চিনব না? এই বাড়িতে আমি থাকব না।' ভাইয়ের চোখ ভিজে ওঠে, গলা ভারি হয়ে ওঠে।

আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'শোন্ মা কী বলে? মা কোন বাড়ি খোঁজে?' আমার অসাধারণ তীক্ষ্ণধী মা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন মায়ের অতীত-বর্তমান কি এলোমেলো হয়ে গেল? মাকে তাঁর বাবার বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি ঘুরিয়ে আনা হয়। সেখানেও মা কেবলই খোঁজেন আর বলেন- না, এটা আমাদের বাড়ি নয়। তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে এলি? মাকে মাইজদি কোর্ট নিয়ে যায় ছোট ভাই আর তার বউ। ওদের সুন্দর দুটো ছেলে দাদুকে জড়িয়ে ধরে। মা ওদের আদর করেন, দু'দিন আনন্দেই থাকেন। তারপরই বলতে থাকেন- এখানে আর কতদিন আমরা বেড়াব ? চল, আমাদের বাড়ি যাই।'বাড়ি যাব, বাড়ি যাব' বলে নাছোড়বান্দা শিশুর মত মা জিদ ধরেন।

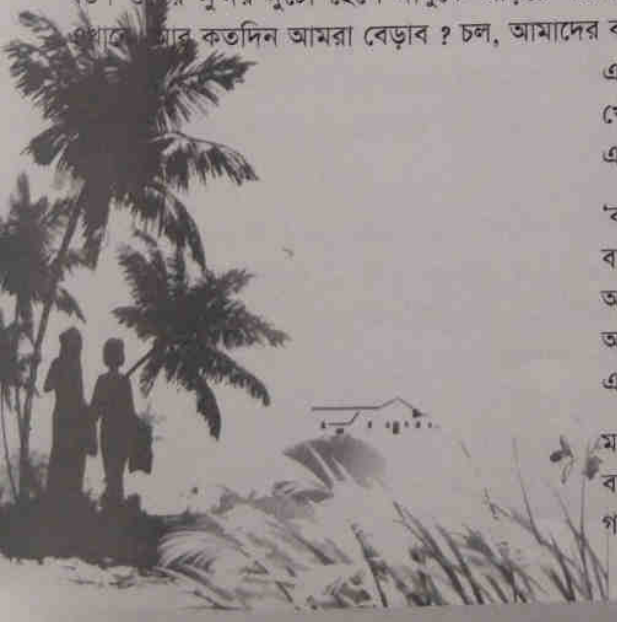

একদিন বিকেলে মাকে ঘরে পাওয়া যায় না। ছোট ভাইয়ের বউটা অস্থির হয়ে খোঁজে। দেখে বাড়ির পেছনে মা একা দাঁড়িয়ে । ও জড়িয়ে ধরে, 'একি মা! এখানে কী করছেন?

'বাড়ি যাচ্ছিলাম। পথ খুঁজে পাচ্ছিনা। পথ হারিয়ে ফেলেছি।' ও বলে- 'চলেন মা, বাড়ি চলেন।' ঘরে এসেই মার এক কথা 'এটা তো আমাদের বাড়ি না। এখানে আমাকে আনলে কেন?' সে বলে, 'কী যে বলেন মা! এটাই তো আপনার বাড়ি। আপনার নিজের বাড়ি। এই দেখুন আপনার নিজের হাতে লাগানো আম গাছ। এই দেখুন বাবার নিজের হাতে লাগানো নারিকেল গাছ।'

মা শোনেন। তাকান অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। তারপর বলেন, 'না, এটা আমাদের বাড়ি না। আমাদের বাড়ি অন্যরকম, আমাদের বাড়ির কোনায় একটা রক্তজবার গাছ আছে। বড় বড় লাল ফুল ফোটে। সেটা কোথায়?'

সে বলে, 'বাবা এখানে যে বাড়ি করেছেন সেটা পুরানো হয়ে ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে। তাই আপনার ছেলে-মেয়েরা নতুন পাকা বাড়ি করেছে। দেখেন কত সুন্দর বাড়ি। আপনার নিজের বাড়ি।'

মা বলেন, 'কি যে পাগলের মত কথা বল! আমাদের বাড়ি এর চেয়ে কত সুন্দর। উনি কত যত্ন করে ভাল ইট-সিমেন্ট দিয়ে ভিটি বাঁধিয়ে ভাল কাঠ-টিন-বাঁশ দিয়ে বাড়ি বানিয়েছেন। সে বাড়ি এত অল্পদিনে পুরানো হবে? ভেঙ্গে যাবে? আমাকে আমাদের বাড়িতে যেতে দিচ্ছ না কেন? '

মাকে আবার ঢাকায় আনা হয়। দেখা করতে যাই, কিছুক্ষণের মধ্যেই মা বলেন, 'আমি একটু আমাদের বাড়ি যেতে চাই। চল্ তো আমাকে নিয়ে।'

বলি, 'মা, আপনি কি মনোহরপুর যাবেন?' মা বলেন, 'সেখানে কেন যাব? সেটা তো আমার বাপের বাড়ি'। বলি, 'মা আপনি কি সিংবাহুড়া যাবেন?' মা বলেন, 'সেখানে কেন যাব? সেটা তো আমার শ্বশুরবাড়ি, আমি তো আমাদের বাড়ি যাব। যেখানে ভিটিপাকা টিনের ছাদের বড় ঘর। দু'পাশে বড় উঠান। উঠানের দু'পাশে অনেক আম, নারিকেল সুপারি গাছ। সামনের উঠানের একপাশে বৈঠকখানা। পেছনের উঠানের একপাশে গোলাঘর, অন্যপাশে রান্নাঘর। সামনে বড় দিঘি।' বলি 'মা সে বাড়ি তো মাইজদি কোর্টে। সেখানে তো মঞ্জু (ছোট ভাই) ওর বউ বাচ্চা নিয়ে আছে। আপনাকে তো সেখানে কয়েকদিন আগেই নিয়ে গেল। আপনি কিছুতেই থাকলেন না।' মা বলেন, ' তোরা বানিয়ে বানিয়ে এত মিথ্যা কথা বলতে শিখলি কবে? আমার সাথে খালি মিথ্যা কথা বলিস। তোদের পাপের ভয় নেই? মঞ্জু তো ওই বাড়িতে থাকে না। মঞ্জুর এ বাড়ি তো অন্য বাড়ি। আমাদের বাড়িটা কেন তোরা খুঁজে পাচ্ছিস না? চল্, তুই আমার সাথে চল্ । আমরা একটু খুঁজলেই পাব। তোর বাবার নাম বলে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।' মা কাপড়-চোপড় গোছাতে থাকেন আর বলেন, 'চল্ যাই, তাড়াতাড়ি যাই। সন্ধ্যা হলে পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

আমার মা হারিয়ে যাওয়া অতীতে নিজবাড়ি খুঁজে বেড়ান। কোথাও খুঁজে পান না। মার মন থেকে কতগুলো বছর একেবারেই হারিয়ে গেছে। মার কাছে বর্তমানটা অচেনা মনে হয়। ডাক্তার দম্পতি পুত্র-পুত্রবধূর আধুনিক ঘর- গেরস্থালি তাঁর অচেনা মনে হয়। মাইজদি কোর্টে গড়া নতুন বাড়ি তিনি নিজের ভাবতেই পারেন না। তিনি তাঁর স্বর্ণময়, কর্মময়, জীবনটি যে নীড়ে কেটেছে সেখানেই প্রত্যাবর্তন করতে চান। আমার মা ঠিকমত খান না, ঘুমান না। কেবলই তাঁর নিজবাড়ি খোঁজেন। আমি মার সামনে থেকে চলে আসি। অক্ষমতার বেদনায় মন ভারি হয়ে উঠে। মার কণ্ঠ শোনা যায়- কই রে, তুই কই গেলি? বাড়ি যাব তো।' জানালার গ্রিলে মাথা রেখে বাইরে তাকাই। আমার নিজ বাড়ি কোথায়? আমি যখন মার মত হব, তখন কি এমনিভাবে ছেলেমেয়েদের কাছে আর্তি জানাব? আমি বলব, 'তোরা আমাকে সেখানে নিয়ে চল- ঐযে যেখানে পথের দু'পাশে পলাশ, কৃষ্ণচূড়া আর মেহগনির সারি। বড় বড় অর্জুন গাছ, মস্তবড় বৃদ্ধ শিশু গাছ। যেখানে পুরানো বটগাছ আর বাঁধানো বটতলা।' আমি কি ভোরবেলা উঠেই মসজিদের পাশের পথটা খুঁজব, যে পথের দক্ষিণে দুইসারি মেহগনির পরেই কার্তিকের শিশিরের চাদর বিছানো মাঠ? লাল ইটের দোতলা বাড়িগুলো কেবলই খুঁজে বেড়াব? আমি কি সেই রাস্তাটি খুঁজব, যার একপাশে লেবুর গন্ধ ছড়ানো ইউকেলিপটাসের সারি আর দু'পাশে বড় মাঠ?

ঝাঁকে ঝাঁকে পবিত্র শুভ্র তারুণ্য খুঁজে বেড়াব ? কচিকণ্ঠের সম্মিলিত উল্লাস শুনতে পাব? আমি কেবলই খুঁজে বেড়াব আর নাছোড়বান্দা শিশুর মত কেবলই বলব, তোরা আমাকে যেতে দিচ্ছিস না কেন? চল্, সেখানে যাই। ঐযে আমাদের বাসা। চল্ যাই, অন্ধকার নেমে আসার আগেই চলে যাই। সেখানে বাতাস বড় স্নিগ্ধ, ফুল-পাতারা ভারী উজ্জ্বল আর সজীব। ভোর, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত সবই কত অন্যরকম আর কত সুন্দর। তোরা আমাকে সেখানে নিয়ে চল্। চুপি চুপি বেরিয়ে আসব আর খুঁজব, কেবলই খুঁজে বেড়াব আমার মায়েরই মত।

আমার দু'চোখ বেয়ে লবণাক্ত, তপ্ত ধারা নামে।

জানা-অজানা

মাহির ফয়সাল
কলেজ নম্বর : ২১০১
শ্রেণী : অষ্টম (দিবা)

হাঁচি হওয়ার কারণ :

আমাদের নাকের স্নায়ুকেন্দ্রগুলো অতি সূক্ষ্ম। শরীরের পক্ষে কোন ক্ষতিকর পদার্থ নাকের মধ্যে দিয়ে শরীরে ঢোকার চেষ্টা করলেই স্নায়ুকেন্দ্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে হাঁচি হয়।

হাই তোলার কারণ :

আমাদের শরীরে কাজের ফলে ক্লান্তি আসে। শরীর ক্লান্তি এলেই বাড়তি অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। হাই তুলে আমরা এই অক্সিজেন টেনে নিই।

চুল বা নখ কাটলে ব্যথা না লাগার কারণ :

চুল বা নখের মধ্যে কোন নার্ভটিস্যু নেই। তাই এগুলো কাটলে কোন ব্যথা লাগে না। কিন্তু চুলের বা নখের গোড়া স্নায়ুর সাথে যুক্ত থাকায় চুল টানলে বা নখ ভাঙলে ব্যথা লাগে।

মানুষের বেঁটে বা লম্বা হওয়ার কারণ :

মানুষের মস্তিষ্কের ঠিক নিচে থাকে পিটুইটারী গ্রন্থি। এ থেকে নির্গত হরমোন (এক ধরনের রস) শরীরের হাড়ের পুষ্টি সাধন করে। পিটুইটারী গ্রন্থি কোন কারণে দুর্বল হয়ে নিজের কাজ যদি ঠিকমত না করতে পারে, তখন মানুষ বেঁটে হয়। আর পিটুইটারী গ্রন্থির কাজ বেশি হলে মানুষ লম্বা হয়।

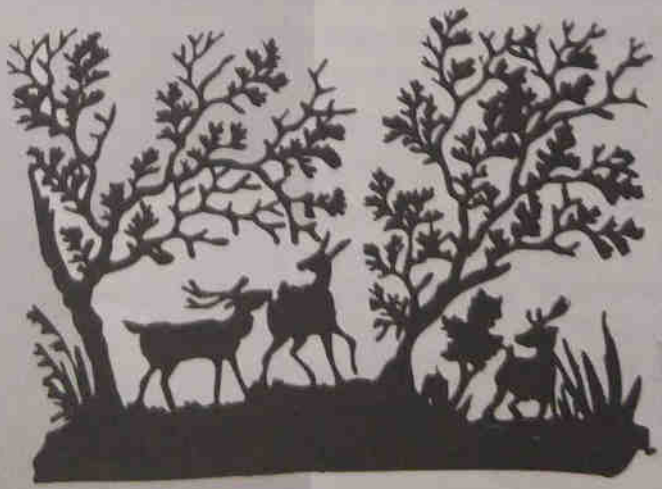

বিজ্ঞানের অজানা রহস্য : অংকে ১৯৬ অ্যালগরিদম

আইনুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ২১৩১
শ্রেণী : নবম (দিবা)

অংক নিয়ে ধাঁধা। সে আবার কি কথা। অংক অবশ্য জিনিসটাইতো একটা বড় ধাঁধার মত। অনেকগুলো ধাঁধা রয়েছে যেগুলোর সমাধান করতে পারলে নোবেল প্রাইজ না পাওয়া গেলেও কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা জুটতে পারে। তার মধ্যে একটা ধাঁধা হলো, "১৯৬ অ্যালগরিদম"। এটা হচ্ছে নাম্বার সিষ্টেমের একটা ধাঁধা। ১৯৬ সংখ্যাটিকে বাগ মানাতে পারছেন না বিশ্বের বড় বড় গণিত পন্ডিতেরা ! ঘন্টার পর ঘন্টা, বছরের পর বছর, বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক প্রোগ্রামের কম্পিউটারের সাহায্যেও সমাধান করতে পারছেন না এই ধাঁধার। মিলিত হন হাজারো বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ।

এই জটিল ধাঁধার ঘটনার সূত্রপাত ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে। আমেরিকার সায়েন্টিফিক ম্যাগাজিনের কম্পিউটার রিক্রিয়েশনস বিভাগের ম্যাথমেটিক্যাল প্যাটার্ন বিষয়ে এফ.গ্রুয়েন বাগারের একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় 'হাউ টু হ্যান্ডেল নাম্বারস উইথ থাউজ্যান্ডেস অব ডিজিটস অ্যান্ড হোয়াই ওয়ান মাইট ওয়ান্ট টু '। সেখানে নিউমেরিক পলি বা প্যালিন ড্রোম সম্পর্কে একটি তথ্য প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই তথ্য নিয়েই মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন গণিত বিজ্ঞানীরা। এই তথ্যের ভেতর ঢুকতে গেলে প্রথমে বুঝতে ও জানতে হবে কিছু সংজ্ঞা যেমন-প্যালিনড্রোমিক নম্বরের ব্যাপারটি কী ? যেসব নম্বর শেষ দিক থেকে পড়লেও মূল নম্বরটিই পাওয়া যায় তাদের প্যালিনড্রোমিক নম্বর বলে। যেমন-৭৮৮৭ সংখ্যাটি। এই সংখ্যাটি উল্টো দিক থেকে পড়লেও হবে ৭৮৮৭। প্যালিনড্রোমিক নম্বর পাবেন এই অ্যালগরিদম এর ভিত্তিতে --

১। যেকোন একটি পূর্ণ সংখ্যা নেয়া হলো।

২। এই সংখ্যার অঙ্কগুলোকে ঘুরিয়ে লেখা হলো। তার ফলে যে সংখ্যাটি পাওয়া গেল, সেটি মূল সংখ্যার সাথে যোগ করা হলো।

৩। এবার যে সংখ্যাটি পাওয়া গেল, সেটি যদি প্যালিনড্রোমিক না হয়, তাহলে দ্বিতীয় ধাপটির পুনরাবৃত্তি করলে (ইটারেশন) সংখ্যাটি প্যালিনড্রোমিক হয়ে যাবে।

মনে করা হচ্ছিল যে, প্রতিটি সংখ্যাই বোধহয় প্যালিনড্রোমিক হয়ে যায় ওপরের ধাপগুলো মেনে চললে। উদাহরণ-ধরুন, মূল সংখ্যাটি হলো ১৩, এই সংখ্যাটিকে ঘুরিয়ে লিখলে হবে ৩১। ১৩ এর সাথে ৩১ যোগ করলে যোগফল হবে ৪৪। এটি ১টি প্যালিনড্রোমিক নম্বর। ১৩ সংখ্যাটি ১টি ধাপের পরই প্যালিনড্রোমিক হয়ে যায়। আবার ধরা যাক, মূলসংখ্যা ৮৭, তাহলে পরপর ধাপগুলো হবে, ৮৭+৭৮=১৬৫, ১৬৫+৫৬১=৭২৬ ; ৭২৬+৬২৭=১৩৫৩; ১৩৫৩+৩৫৩১=৪৮৮৪, সুতরাং ৮৭ সংখ্যাটি ৪টি স্টেপে বা ইটারেশনে প্যালিনড্রোমিক হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো ১০,০০০ এর নিচের সংখ্যা রাশিগুলোর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ সংখ্যা চার বা তার কম পর্যায়ে প্যালিনড্রোমিক নম্বর হয়ে যায়। প্রায় ৯০ শতাংশ সংখ্যা ৭ বা তার কম পর্যায়ে প্যালিনড্রোমিক হয়ে যায়। ৮৯ হচ্ছে এমন একটি সংখ্যা, যেটি মাত্র ২৪টি ধাপের পর প্যালিনড্রোমিক হয়।

যা হোক, ১৯৬ সংখ্যাটিকে কতবার ইটারেশন করলে সেটি প্যালিনড্রোমিক হয়, এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা চালালেও গণিতজ্ঞরা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলতে পারেনি। এই বিষয়ের উপর যে গবেষণা, তারই মূল পোশাকি নাম '১৯৬ অ্যালগরিদম' বা '১৯৬ প্রবলেম' বা '১৯৬ প্যালিনড্রোম কোয়েস'? ১৯৬ অ্যালগরিদম সম্পর্কে গবেষণার কয়েকটি নমুনা দেখালেই বোঝা যাবে, কেন এটি গণিত শাস্ত্রের একটি অন্যতম বড় ধাঁধা। নিচে ১৯৬ সংখ্যাটির অ্যালগরিদম গবেষণার দিকগুলো লেখা হলো :

১। জন ওয়াকারের 'থ্রি ইয়ার্স অব কম্পিউটিং' এতে প্রায় ৩ বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে ও জন ওয়াকারের ১৯৬ এর ২৪, ১৫, ৮৩৬ বার ইটারেশন করেও দেখেছেন প্যালিনড্রোম হয়নি।

২। টিম আরভিন ১৯৬ সংখ্যাটি ইটারেশন ২০,০০,০০০ অঙ্ক ওয়ালা একটি সংখ্যা পর্যন্ত পৌছান। তবুও সেটির প্যালিনড্রোমিক হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি।

৩। ২০০১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চালানো গবেষণায় ১৯৬ সংখ্যাটির ইটারেশন করে ১,৩০,০০,০০০ অঙ্কের একটি সংখ্যার পৌছালেও প্যালিনড্রোমিক হয়নি।

খেলাধুলা বিষয়ক তথ্য-বিচিত্রা

পীয়্যান মুগ্ধ নবী
কলেজ নম্বর : ৩৩৩৯
শ্রেণী : নবম (দিবা)

১। বিশ্বকাপ ফুটবল ইতিহাসে প্রথম গোলদাতা হচ্ছেন লুসিয়ে লরা (ফ্রান্স)।
২। বিশ্বকাপ ফুটবল ইতিহাসে এক ম্যাচে সর্বাধিক দর্শক উপস্থিত থাকার রেকর্ড হচ্ছে ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালের ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচ। ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়ামে সেদিন ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮ শত ৩৫ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।
৩। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে এক ইনিংসে দুটো হ্যাট্রিক করার কৃতিত্ব শুধুমাত্র জিমি ম্যাথু-এর। তিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১৯২৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই রেকর্ড গড়েন।
৪। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম রান নেন ল্যান্স ব্যানার ম্যান (অস্ট্রেলীয়)।
৫। স্যার ডন ব্র্যাডম্যান-ই হচ্ছেন একমাত্র ব্যাটসম্যান, যিনি তার খেলোয়াড়ী জীবনে মাত্র একবার '০' রানে আউট হয়েছেন। যার কারণে তার ব্যাটিং গড় হয়েছিল ৯৯.৯৪।
৬। ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম টেস্ট এবং প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচ দুটোই অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড খেলেছে এবং কাকতালীয়ভাবে এদু'টো ম্যাচই হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে।

সামনুন সালেহীন সৌরভ
কলেজ নম্বর : ২৯৫০
শ্রেণী: নবম (দিবা)

আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ সংখ্যক গোলদাতা ইরানের আলী দাইয়ি। এর আগে এ রেকর্ড দখলে ছিল হাঙ্গেরীর ফেরেঙ্ক পুসকাসের। তবে সবচেয়ে বেশি গড় গোলের অভাবনীয় রেকর্ড জার্মানির জার্ড মুলারের (৬২ ম্যাচে ৬৮ গোল)। পেলেই একমাত্র ফুটবলার যার হাজার গোল নিয়ে কোন সংশয় নেই। ফেরেঙ্ক পুসকাসের দাবী, তিনি কম করে হলেও ১৫০০ গোল দিয়েছেন। এছাড়া এক অপেশাদার ব্রাজিলিও ফুটবলার রোমারীও এবং অষ্ট্রিয়ান এক ফুটবলারের এ খ্যাতি থাকলেও ফিফা কর্তৃক স্বীকৃত নয়। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিল কলম্বিয়ান আন্দ্রেস এস্কোবারকে। তার আত্মঘাতী গোলের জন্য ১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়ে তার দল। পরে অজ্ঞাত আততায়ীরা তাকে গুলি করে হত্যা করে। বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় হয়েও কখনো জাতীয় দলের হয়ে খেলতে পারেননি আর্জেন্টিনার আলফ্রেডো ডি স্তেফানো।

রিয়াল মাদ্রিদের সাথে বিরোধের জন্য এফ সি বার্সেলোনা অনুশীলনেও কখনো সাদা জার্সি ব্যবহার করে না। ফুটবলের মহাকাব্যে সবচেয়ে উপেক্ষিত নায়ক "গারিঞ্চা" (এটি তার আসল নাম নয়), জন্মের সময় তার বাঁ পা ছিল পঙ্গু, ক্রমে বাঁ পায়ে লাথি মারতে শেখেন, তাঁর বাঁ পা ছিল অন্য পায়ের চেয়ে ২ সেন্টিমিটার ছোট, এই বাঁ পা দিয়েই পরবর্তীতে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁর ফ্রি-কিক 'ফজিলা সেকা' বা 'ডেড লিক' বা 'ফলিং লিফ' কিংবা 'ঝরা পাতা' শট গতিপথে দু'বার বাঁক খেত, রানে গতিপথে দু'বার দিক পরিবর্তন করত। যিনি এক রুমাল পরিমাণ জমিতে তিনজন ডিফেন্ডারকে ছিটকে ফেলে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন তার নাম ডিয়েগো আরমান্ডো ম্যারাডোনা।

মডেল প্যাঁচালি

সৌরভ, মাহদী, জাওয়াদ, জাহিন
শ্রেণী : একাদশ (প্রভাতী)

১। **DRMC তে প্রথম প্রবেশ করে তোমার মনের অনুভূতি .....**

ক) এ-এত্তো বিশাল কলেজ। (৪৭%)
খ) কোন দিকে যাব ! (২৩%)
গ) বাহ্ ঘোড়া দুটো বেশ সুন্দর তো ! (১৬%)
ঘ) সেই কবেকার কথা, ভুলে গেছি। (১৪%)

মন্তব্য : হায়রে মানব মেমোরী! এত বছর পড়ার পর সবই ভুলে গেলি?

২। **আমাদের কলেজ ড্রেস সাদা কেন ?**

ক) শুভ্র শুদ্ধতার প্রতীক (৬১%)
খ) কাক ইয়ে করলে যাতে বোঝা না যায়। (১২%)
গ) আমরা খুবই নিষ্পাপ! (৬%)
ঘ) আসলে সাদা না, বেনীআসহকলা একসাথে। (২১%)

মন্তব্য : প্রতীকের মূল্য ক'জন বোঝে ?

৩। **আমাদের কলেজের ফ্যানগুলোর দিকে তাকালে তোমার কী মনে হয়?**

ক) ফ্যানগুলোর দিকে তাকালে মনে পড়ে লাইফ ইন্স্যুরেন্সটা এখনো করা হয়নি (৬৩%)
খ) আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলেই একটা ফ্যানের যাদুঘর খুলতে পারি। (২০%)
গ) কিছু ফ্যানের কাশি হয়েছে (গরগর আওয়াজ করে) (১৪%)
ঘ) ফ্যানগুলো Expire Date পার হয়ে গেছে। (৪%)

মন্তব্য : কিছু সংখ্যক ফ্যানকে অতিসত্ত্বর অবসর দেয়া হোক।

৪। **C.T. তে কি কর ?**

ক) প্রায়ই সেট লিখতে ভুলে যাই। (৪১%)
খ) It's a secret। (২৮%)
গ) সত্যি বলছি, অন্যকারো খাতা দেখিনা। (২৬%)
ঘ) চল, অন্য প্রসঙ্গে যাই। (৪%)

মন্তব্য : secret এখন আর secret নেই, open secret হয়ে গেছে।

৫। **আমাদের অডিটোরিয়ামটা কেমন ?**

ক) দারুন। (৫২%)
খ) মোটামুটি। (১২%)
গ) ছাদ ফুটা ছিল, পানি পড়ে না কেন? (১০%)
ঘ) সাউন্ড সিস্টেম ভালনা। (২৬%)

মন্তব্য : যে যাই বলুক না কেন, আমাদের অডিটোরিয়ামটা কিন্তু আসলেই জোশ।

৬। **টিফিন নিয়ে তোমার মতামত ....**

ক) শনিবার টিফিনটা (স্যান্ডউইচ) জোশ। (৭৫%)
খ) চিকেন সমুচার চিকেন দেখতে মাইক্রোস্কোপ লাগবে। (৯%)
গ) জিলাপী ভাল লাগেনা। (১%)
ঘ) জিলাপী ভাল লাগে। (১৫%)

মন্তব্য : ইস্ যদি সবদিন শনিবার হতো....!

৭। **কলেজ লাইব্রেরি সম্পর্কে .....**

ক) প্রতিদিন প্রবেশাধিকার চাই। (৪০%)
খ) আরও ভাল ভাল বই চাই। (২০%)
গ) লাইব্রেরি যাইনা তাই মন্তব্য নেই। (২০%)
ঘ) যে ম্যাগাজিন চাই, সেটাই পাই না। (২০%)

মন্তব্য : আবার তোরা মানুষ হ।

৮। **পরীক্ষায় খারাপ করলে কি কর ?**

ক) মনে মনে ভাবি, Failure is the piller of Success । (১৯%)
খ) ঠিক আছে, পরের বার দেখে নেব। (৩৫%)
গ) বাসায় খাতা দেখাই না। (৩০%)
ঘ) দুই দিন শোক পালন করি। (২২%)

মন্তব্য : ফেলটুশদের অতিসত্বর তদবীর কোম্পানীতে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

৯। **কলেজের Discipline সম্পর্কে ....**

ক) ছেড়ে দে বাপ, কেঁদে বাঁচি (৩০%)
খ) ফি-রি-য়ে দাও, হারানো চুলগুলো ফিরিয়ে দাও। (৪২%)
গ) শিথিল করতে হবে। (২৪%)
ঘ) এটা কোন Discipline হলো? (৫%)

মন্তব্য : বাঁচাও ! এত্তো Discipline থাকা সত্ত্বেও ঐ ছেলে বলে কোন Discipline নাই।

১০। **এ বছরের সবচাইতে সফল অনুষ্ঠান .....**

ক) ৫ম ও ৮ম শ্রেণী বৃত্তি এবং এস.এস .সি ও এইচ.এস.সিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান (৪৫%)
খ) নবীন বরণ (২৭%)
গ) সংস্কৃতি সপ্তাহ (১৬%)
ঘ) ২১ শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন (১২%)

মন্তব্য : এ বছর মোটামুটি সব অনুষ্ঠানই ভাল হয়েছে। তবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটা ছিল জোশ্।

১১। **কলেজে নতুন ক্লাব গঠন করলে তা কি হওয়া উচিত?**

ক) কুইজ ক্লাব (৩৭%)
খ) স্পোর্টস ক্লাব (৭%)
গ) ফান ক্লাব (২২%)
ঘ) আঁতেলেকচুয়াল ক্লাব (১৪%)

মন্তব্য : আর যাই কর আঁতেল ক্লাব নয়। পুরনো আঁতেলদেরই ভাত নাই, নতুন আঁতেল সৃষ্টি হলে ....

১২। আমাদের কলেজের ছুটির পরিমাণ কেমন?

ক) খুব কম (৩৫%)
খ) খুব বেশি (৮%)
গ) মোটামুটি (৪৩%)
ঘ) ক্যালকুলেটরটা দে তো (১০%)

মন্তব্য : ঐ ৮% ছেলেকে 'ছুটি' দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হোক।

১৩। বড় হয়ে কি করবে?

ক) সুনাগরিক হব (৩৩%)
খ) আগে থেকে সম্পদের হিসাব রাখব (১৩%)
গ) আম্মুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে (২০%)
ঘ) বড় হব মানে, আমি তো বড় হয়েই গেছি (২৭%)

মন্তব্য : ঐ একটা ফিতা আনতো। মেপে দেখি কত বড় হয়েছে।

১৪। কলেজে সম্প্রতি নিয়মিত H.W দেয়ার ফলে কি অবস্থা ?

ক) খুব উপকার হয়েছে, হাত এখন আলোর বেগে চলে (১০%)
খ) লিখতে লিখতে হাতে গিট্টু লেগে গেছে (২০%)
গ) আমি এখন বাথরুমে বসেও লিখি (১০%)
ঘ) খাতা শেষ (৬০%)

মন্তব্য : **Reply's belive it or not** লিখলে হাতে গিট্টু লাগে।

১৫। ক্লাস চলাকালীন কি কর ?

ক) টিচারের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি (৩৫%)
খ) সাহিত্য চর্চা করি (৩০%)
গ) কিঞ্চিৎ নিদ্রা যাপন করি (২৫%)
ঘ) জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতি দর্শন করি (১০%)

মন্তব্য : বাহ! এরকম সাহিত্য চর্চা আর প্রকৃতি দর্শন চলতে থাকলে অচিরেই আমাদের কলেজ বিখ্যাত সব সাহিত্যিক আর প্রকৃতিবিদে ছেয়ে যাবে।

১৬। Valentines Day সম্পর্কে তোমার মতামত কি?

ক) এটা হচ্ছে ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভার জন্মদিন (৯%)
খ) সত্যি বলছি আমি এখনো ..... (৪৭%)
গ) Valentines Day এটা আবার কি? খায় না মাথায় দেয় (২৫%)
ঘ) অপসংস্কৃতি (২০%)
ঙ) Foreign brand তো! নামের মধ্যেই একটা ইয়ে আছে।

মন্তব্য : এই Foreign Foreign করেইতো দেশ দেওলিয়া হওয়ার যোগাড়!

১৭। T.V'র জনপ্রিয় এ্যাড

ক) সেই দিন কি আর আছে, বদলাইছে না? (বাংলালিংক) (২৭%)
খ) ঢাকায় টাকা উড়ে (প্রাণ) (১৬%)
গ) নে বাবা এবার নাকে তেল দিয়ে ঘুমা (আশিয়ান সিটি) (৪৫%)
ঘ) ইউনুস তোর হাতের আঙ্গুল কয়টারে ? (একটেল) (১২%)

মন্তব্য : জি বাবা, এবার নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবো।

১৮। রঙিন ক্যামেরা দিয়ে কোন কোন জিনিসের রঙিন ছবি তোলা যায় না?

ক) জেব্রার (২৩%)
খ) কাকের (২৬%)
গ) আমাদের কলেজ ড্রেসের (৩০%)
ঘ) পানির (২১%)

মন্তব্য : ক্যান- ছবি তোলার আর কিছু নাই?

১৯। বিজ্ঞানী নিউটন বৃটেনে না জন্মে বাংলাদেশে জন্মালে কি হতো?

ক) আরেকজন বাঙ্গালী নোবেল পেত। (২০%)
খ) নিউটন রাজনীতি শুরু করতেন। (৬০%)
গ) বাংলাদেশ বৃটেন হয়ে যেত। (১০%)
ঘ) নিউটন আপেল গাছের তলায় না বসে ডাব গাছের তলায় বসতেন আর... (১০%)

মন্তব্য : তাতে কী রাজনীতির গুণগত ও mean....

২০। বাংলাদেশের যেসব দুর্নীতিবাজ এখন জেলে তাদের প্রসঙ্গে-

ক) নে বাবা এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমা। (৬২%)
খ) যেমন কর্ম তেমন ফল। (৬%)
গ) ভাবিয়া করিও কাজ। (২২%)
ঘ) সেই দিন কি আর আছে, দিন বদলাইছে না ? (১০%)

মন্তব্য : দিন সত্যিই বদলায়া গেছে। অহন বদলি চেহারা টিকলে হয় !

২১। কলেজে আনন্দের দিন ...

ক) Excursion । (৪৪%)
খ) স্পোর্টস ডে। (৩২%)
গ) নবীন বরণের দিন। (১৪%)
ঘ) নাই নাই নাই আনন্দ বলে কিছু নাই। (১০%)

মন্তব্য : ওদের (১০%) অতি সত্ত্বর একটা আনন্দের ইনজেকশন দেয়া হোক। মনের দরজায় চাবি দিয়া আ-বা-র জিগায়!

২২। প্রিয় সংলাপ...

ক) সূত্র পারলে অংক পারা যাবে আরি। (৬১%)
খ) বাবারা Underline করে নাও। (২০%)
গ) মাইনে ইডা একটা ছালাকি। (৫%)
ঘ) হেই আ-আ-স্তে। (১১%)

মন্তব্য : Don't mind Please.

২৩। ছাত্র জরিপ নিয়ে তোমার ধারণা...

ক) কোন ধারণা নেই। (৬%)
খ) ছাত্র জরিপ জানি কত পৃষ্ঠায়। (২২%)
গ) এটা কোন জরিপ হল, আমি হলে আরও। (২২%)
ঘ) How Funny ! (৩৭%)
ঙ) জরিপ আবার কবে হলো ? (১৪%)

মন্তব্য : যেদিন তুমি ঘুমিয়ে ছিলে সেদিন জরিপ হয়েছে।

শেষ কথা

কলেজের ছাত্রদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিরক্তি, হতাশা তুলে ধরাই ছিল আমাদের জরিপের উদ্দেশ্য। জরিপের কোন মন্তব্যে কেউ যদি দুঃখ পান তাহলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা

জোবায়ের মাহমুদ অর্ণব

কলেজ নম্বর : ৪১২৪
শ্রেণী : পঞ্চম (দিবা)

১। বাবা : পাস করলে তোকে একটা সাইকেল কিনে দেব বললাম, তবু তুই পাস করলিনা। এতদিন কি করছিলি?
ছেলে : এতদিন সাইকেল চড়া শিখছিলাম।

২। স্যার : আমার সাজেশনটা ফলো করেছ তো?
ছাত্র : ফলো করলে আমি মরে যেতাম
স্যার : কিভাবে?
ছাত্র : সাজেশনটা ট্রেনের নিচে পড়ে গিয়েছিলো যে।

৩। ক্রেতা : আমাকে একটা বড় ব্যাগ দিন। এখনই বাস ধরতে হবে।
বিক্রেতা : মাফ করবেন, বাস ধরার মত ব্যাগ আমার নেই।

৪। শিক্ষক : প্রশ্ন কি খুব কঠিন হয়েছে ?
ছাত্র : জ্বী না স্যার।
শিক্ষক : তবে কী ?
ছাত্র : স্যার উত্তরগুলো কঠিন।

সৈয়দ ফাহাদ ইবনে আলম

কলেজ নম্বর : ৪১৮১
শ্রেণী : পঞ্চম (দিবা)

দুই বন্ধু বিদেশে গিয়েছে–
১ম বন্ধু : এত বড় বড় বাড়ি কিভাবে বানাল?
২য় বন্ধু : মাটিতে শুইয়ে বানিয়েছে।
১ম বন্ধু : তাহলে ওটাকে রং করেছে কিভাবে?
২য় বন্ধু : তাও শুইয়ে রং করেছে।
১ম বন্ধু : তাহলে ওটাকে দাঁড় করেছে কিভাবে?
২য় বন্ধু : কেন জাতীয় সঙ্গীত গাইয়ে।

সামিউল ইসলাম

কলেজ নম্বর : ৪২২৮
শ্রেণী : পঞ্চম (প্রভাতী)

জনৈক ভদ্রলোক ভিখারীর সঙ্গে কথা বলছেন–
ভদ্রলোক : কি হে, কাল দেখলাম একটা থালা পেতে পয়সা নিচ্ছ। আজ দুটো থালা দেখছি কেন?
ভিখারী : আপনাদের দয়ায় পয়সা কড়ি ভালই পাচ্ছি। তাই একটা ব্রাঞ্চ খুললাম।

আব্দুল্লাহ আল জায়েদ

কলেজ নম্বর : ৯৯১০
শ্রেণী : ষষ্ঠ (প্রভাতী)

১। শিক্ষক ক্লাসে এসে বললেন, তোমরা কে কে বেহেশতে যাবে হাত উঠাও। একজন ছাড়া সব ছাত্রই হাত উঠাল।
শিক্ষক : তুমি বেহেশতে যাবে না কেন ?
ছাত্র : (কেঁদে বলল) স্যার, আম্মু বলেছে ক্লাস ছেড়ে কোথাও যেন না যাই।

২। ছেলে : মা, আমি পরীক্ষায় ১০০ নম্বর পেয়েছি।
মা : সাবাস, কোন্ সাবজেক্টে ?
ছেলে : অঙ্কে ২০, ইংরেজিতে ৩০, বাংলায় ৩৫ আর আর্ট-এ ১৫।

সাদাব আহমেদ

কলেজ নম্বর : ২১৪৭
শ্রেণী : নবম (দিবা)

১। **কলম্বাস আমেরিকার প্রথম পা ফেলার পর কী করে?**
উত্তর : দ্বিতীয় পা ফেলে।

২। **এলিয়ানরা কোন গাড়ি ব্যবহার করেন?**
উত্তর : এলিয়ন।

নাদিম ইউসুফ খান

কলেজ নম্বর : ২৯৪১
শ্রেণী : নবম (দিবা)

চোর ও চোরের গিন্নির কথোপকথন–

চোর : গিন্নি, অনেক ভাইবা দেখলাম–আইজ অইতে চুরি ছাইড়া দিমু।
চোরের গিন্নি : সত্যি কইতাছ ?
চোর : হ, যা দিনকাল পড়ছে। এখন আর চুরি কইরা পুষাইব না। তাই ভাবতাছি-কাইল থেইকা ডাকাতি শুরু কইরা দিমু।

দেবাশিষ দে

কলেজ নম্বর : ২১৬০
শ্রেণী : নবম (দিবা)

- দুই ভদ্রলোক তর্ক বিতর্কের এক পর্যায়ে ১ম জন ২য় জনকে বলল, "থাপ্পড় মেরে ৬৪টি দাঁত ফেলে দেব"। পাশ দিয়ে যাওয়া এক ভদ্রলোক বললেন-আরে ভাই মানুষের দাঁতই-তো বত্রিশটা, আপনি ৬৪টা ফেলবেন কি করে?
  ১ম জন : আমি জানতাম আমাদের ঝগড়ার মাঝখানে কেউ না কেউ মীমাংসা করতে আসবে, তাই তার দাঁতসহ একেবারে বলেছি।

- ১ম বন্ধু : তার চোখ দুটো ছিল বেতফলের মতো সজল, গাল দুটো ছিল পাকা টমেটোর মতো, ঠোঁট দুটো যেন দু'ভাগ করা গাজর, সেই আমার প্রিয়া।
  ২য় বন্ধু : প্রিয়া বলছিস কেন ? বল সেই ছিল তোর সালাদ।

- শিক্ষক : এই বলতো, 'আমি সিগারেটের ধূঁয়া পান করি' এটা কোন কারক ?
  ছাত্র : স্যার, ক্ষতিকারক।

- স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করল : আমি যখন গান গাই তখন তুমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও কেন ?
  স্বামী : যাতে করে প্রতিবেশীরা ভুল না করে যে, আমি তোমাকে পেটাচ্ছি আর তুমি চেচাঁচ্ছ।

- দুই বন্ধু রসিকতা করে একজন আর একজনকে প্রশ্ন করল :
  ফারহান : আচ্ছা গালিব তুই কাকে ভয় করিস ? বাঘকে নাকি মশাকে ?
  গালিব : আমি বাঘকে বেশি ভয় করি।
  ফারহান : আমি মশাকে বেশি ভয় করি।
  গালিব : বাঘের ভয়ে আমরা বাঘকে খাঁচায় বন্দী করি। কিন্তু মশার ভয়ে আমরা নিজেরা খাঁচায় ঢুকি।

অনুপ কুমার সরকার

কলেজ নম্বর : ১০২৯০
শ্রেণী : একাদশ (প্রভাতী)

এক বোকা লোক দোকানে গিয়েছে পান খেতে–
দোকানদার : আপনি কি দিয়ে খাবেন?
ভদ্রলোক : কেন দাঁত দিয়ে।
দোকানদার : আমি তা বলছি না, আপনি পান কিভাবে খাবেন?
ভদ্রলোক : কেন চিবিয়ে খাব।
দোকানদার : আপনি কি খয়ের খান?
ভদ্রলোক : না, আমি নাদের খান।

স্মৃতির আঙিনায়

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০০৮ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০০৮ এর উদ্বোধনী দিনে কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৮এ পিটি ডিসপ্লে পরিবেশন করছে ছাত্ররা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৮এ পিটি ডিসপ্লে পরিবেশন করছে ছাত্ররা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৮ এ পিলো ফাইটিং

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৮ এ ছাত্রদের হুইল অ্যান্ড ব্যারো

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৮ এর যেমন খুশি সাজো

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৮ এর যেমন খুশি সাজো

ছাত্রদের আকর্ষণীয় ৩০০০ মিটার সাইকেল রেস শুরুর মুহূর্ত

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০০৮ এ বিজয়ী ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০০৮ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণের জন্য মঞ্চে মাননীয় শিক্ষা সচিব

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০০৮ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে অভিবাদন গ্রহণ করছেন মাননীয় শিক্ষা সচিব

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৮ এ কলেজ স্কাউট কন্টিনজেন্ট কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করছে

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৮ এ ছাত্রদের দৌড়

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৮ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন কলেজের অধ্যক্ষ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৮ এ আমন্ত্রিত অতিথির একাংশ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৮ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় শিক্ষা সচিব

বিজয়ী ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০০৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) কায়সার আহমেদ

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০০৮ এ চারু ও কারুকলা প্রতিযোগিতা পরিদর্শনে প্রধান অতিথি

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০০৮ এ সঙ্গীত পরিবেশন করছে ছাত্ররা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি

মহান জাতীয় শহীদ দিবসে কলেজের প্রভাত ফেরির একাংশ

প্রভাতফেরি শেষে কলেজ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ- ২০০৮ এর সমাপনী দিবসে ভাষণ দিচ্ছেন অধ্যক্ষ

সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সমাপনী দিনে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি সচিব-পত্নী বেগম নাসরিন ইসলাম

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংকনরত ছাত্ররা

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০০৮ এর সমাপনী দিবসে চারু ও কারুকলা প্রদর্শনী দেখছেন প্রধান অতিথি

মহান স্বাধীনতা দিবসে অধ্যক্ষ মহোদয়ের রচিত ও নির্দেশিত নাটক পরিবেশন করছে ছাত্ররা

আন্তঃহাউস সাধারণ জ্ঞান ও ধাঁধা প্রতিযোগিতা শেষে ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ

পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

রসায়ন বিজ্ঞান গবেষণাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

জীববিজ্ঞান গবেষণাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

ভূগোল গবেষণাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

গণিত গবেষণাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

কলেজ গ্রন্থাগারে অধ্যয়নরত শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ

কম্পিউটার গবেষণাগারে শিক্ষারত ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা

কলেজ হাসপাতাল

কলেজ ফুটবল দল (জুনিয়র)

কলেজ ফুটবল দল (সিনিয়র)

কলেজ ভলিবল দল

কলেজ বাস্কেটবল দল

কলেজ ক্রিকেট দল

সাপ্তাহিক সমাবেশে কুচকাওয়াজ

অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে অধ্যক্ষ

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাঝে অধ্যক্ষ

English Section

POEMS

TO MY PARENTS

SHOVON-BIN-YOUSUF
College No: 9799
Class: VI (Morning)

Love to my mother,
Love to my father.
I will never forget you,
I can give my life for you.
I came to this world,
Because of you
Your love and care
Has brought me up
As a perfect person.
My words can't express
How much I love you.
Thank you for giving
the opportunity
To call you my parents.

SAFETY FIRST

FARHANUL KARIM
College No: 3770
Class:VI (Day)

Up the street I look to see
If any traffic's near to me;
Down the street I look as well,
And listen for a horn or bell.
There's something coming – wait a bit!
If I run out I may be hit!
But now the road is really clear.
No car nor motor-bus is near,
I'll run across the road so wide.....
HURRAH! I'm safe on the other side!

TO OUR BELOVED LAST PROPHET

MOHAIMINUL ISLAM
College No: 4572
Class: VI (Day)

The world was delighted at his birth
Really causing among all much mirth.
The world at last found its direction
Benefiting from his instruction.
Allah through him to man revealed
The Holy Quran that acts as a shield
Against all deeds, unjust and vicious,
And that makes humanity precious.
To our beloved last Prophet we're grateful;
Were he alive today, it would be wonderful!

LITTLE BIRD

FAISAL BIN ALAM
College No: 10013
Class: IX (Morning)

Sing, sing little bird,
Your song touches my heart.
You look very sprightly,
That makes me truly jolly
Your sweet voice simply maddens me.
Often I run with glee
Oh! Little sweet bird.
Don't leave me alone
Please be my neighbour,
That I may see you again and again.

ENLIGHTEN ME

RAZU HOSSAIN KHAN
College No: 8001
Class: XI (Morning)

Who could give me light
A life that is colourful and bright?
A life free of all corruption
Ensuring our safe destination.
It is high time we saved our country
And it demands people's integrity
So come and join with me,
If you want to live a life, corruption free.

THE LAST MOMENT

ISHRAQ ELAHI
College No: 8665
Class : XI (Morning)

The sun has set,
The candles also have blown out
Everything is set for me
And I feel someone calling me from far.
As I wait for the last moment,
I can remember some sweet memories,
And also can feel some intolerable sufferings.
Then a very dear face comes to me
The face which is filled with love sacrifices.
She is the one who taught me to be me
Now I'm leaving her,
Having a step towards my last sleep.
I want to say a few last words
Mom, I love you.
I don't want to leave you.

IF I CAN

MD. NAZMUL ISLAM
College No: 9105
Class : XI (Morning)

If I can,
I will take away the beauty
From the flowers and sprinkle
Your life with it.
If I can,
I will take the brightness
From the sun and illuminate
Your life with it.
I know they are my
Wishful thinking but they are
Expressive of my desire
To see you happy.

FRIENDSHIP

MAHMUDUL HAQ KHAN
College No: 2916
Class: XI (Day)

Make your wishes come true,
See who is braver than you
And think who is your friend
That sets the trend.
Then I am a friend
And forget me never.
A friend never goes away,
As he is for ever.

MY FRIEND

TAUFIQ YEASIN SUNNY
College No: 1853
Class: IX (Day)

It is true, I won't be here, my friend
But does it mean our friendship
will ever end ?
It is true, I won't be here
But I can't imagine your eyes full of tear,
It is true, I will leave
And go far far away
It is true, I will leave
But we will meet again some day.
It is true, I will miss you so so much
But does it mean our friendship
Won't grow on hatch ?
Oh, my friend, I am not unkind.
And the memories we shared
Will be locked for ever in mind.
It is true, I will leave and go far far away,
It is true, I will leave
But we will meet again some day.

YOUR HISTORY

MITHUN KUMAR DEY
College No: 1521
Class: XI (Morning)

Don't you remember your early days
Passed playing with some friends
Like burnt grains?
But those happy days
Will never return
Even if paid with respect
As they are gone.
Don't you remember your busy days,
Passed in works and duties
With some guests on holidays,
Like busy bees gathering sweet honey?
But these gala days
Will never return
Even if paid with respect
As they are gone.
Don't you remember your old days
Passed in rest and prayer,
with some deadly diseases
Like a dried flower
with its lost smell?
But those last days
Will never return
Even if paid with respect,
As they are gone.
At last you will find yourself in a grave,
Which is peaceful. But you crave
For anything – Even, even a leaf.
But with the cruel death
Which will stop your breath,
And also with three quarters of land
Which separates you from your lover's hands.
You will be your history
Which is not a mystery.

RIDDLES & JOKES

NAFIS IRTEESHAM

College No: 10389
Class: IV (Morning)

1. Which key doesn't fit in a key hole? Ans: A monkey.
2. Which dress can't you wear? Ans: An address.
3. Which bow can't be untied? Ans: A rainbow.
4. A man went out for a holiday on Friday, stayed three days and came back on Friday, How is that possible? Ans: His horse was named Friday.
5. What cannot be used until it is broken? Ans: An egg.
6. What has hands and necks but no head and leg? Ans: A shirt.

SHANIM AHMED SOUMIK

College No: 4556
Class: IV (Day)

Father : My son, why do you always ask me questions ?
Son : I want to know many things.
Father : How many things do you want to know ?
Son : Father, now you are asking me questions.
Father : Where am I asking you questions ?
Son : Again you are asking me questions.
Father : OK! If I am asking you questions then why are you not telling me the answers?

SOME INFORMATION

WORLD CUP LEGENDS

MD. NOMANUR RASHID
College No: 10017
Class: X (Morning)

1. Clive Loyd (West Indies) : The cat who dominated world cricket for a decade.
2. Viv Richards (West Indies) : The original Master Blaster.
3. Imran Khan (Pakistan) : The greatest King Khan.
4. Javed Miandad (Pakistan) : He redefined one-day cricket.
5. Wasim Akram (Pakistan) : The Sultan of swing.
6. Kapil Dev (India) : He conquered the world.
7. Sachin Tendulkar (India) : The genius shines brightly at the mega event.
8. Martin Crowe (New Zeland) : Master batsman and even bigger tactician.
9. Steve Waugh (Australia) : It's all about guts and grit.
0. Shane Warne (Australia) : Enter the showman.
11. Glenn McGrath (Australia) : The pigeon.

WORLD'S FESTIVALS

C.M MUKTADIR
College No: 9033
Class: XI (Morning)

- **Rhine in Flames:** In this festival, each year 5,00,000 visitors experience the magical nights in the Rhine valley when they glide along the river in 80 steamers. It's from 5 May-15 September.
- **Oktoberfest:** It is from 22 September-7 October. It is the world's biggest festival which takes place in Munich. Millions of people from around the globe come to Bavaria for first-hand experience of the hearty atmosphere in the traditional beer tents.
- **Leipzig Book Fair:** "Leipzig reads" is the motto of the springtime book fair. In addition to Europe's biggest literary reading festival, bookworms discover the latest trends and writers from around the globe. It is from 13-16 March.
- **Munich Film Festival:** It is from 23-30 June; Germany's most important summer film festival shows world premieres. The Munich Film Festival shows 200 films on 15 screens.
- **New Year at the Brandenburg Gate:** It is on 31 December. At midnight the champagne corks start popping all over Germany. But the biggest gathering of people welcoming the year will be at the Brandenburg Gate in Berlin. Over one million people are expected at Europe's biggest New Year party.

SOME QUESTIONS AND ANSWERS

SADI M. JAWAD AHSAN

College No: 9100

Class: XI (Morning)

1. **How tall is a giraffe?**

Ans : A male giraffe stands up to 5.5 metres (18ft) tall to the tips of its horns. It has an extraordinary long neck and its front legs are longer than its back legs. So the body slopes down towards the tail. The long neck allows it to feed on high leaves of trees, which other animals can't reach.

2. **How many bones are there in a giraffe's neck?**

Ans : A giraffe has seven bones in its neck, just like other mamals including humans. But the giraffe's neck bones are much longer than those of other animals and have more flexible joints between them.

3. **How windy is Saturn?**

Ans : Saturn's winds are even faster than Jupiter's and roar around the planet up to 1800 kmph (1120 mph). Neptune's are faster!

4. **What's the smallest particle?**

Ans : The smallest particle inside the nucleus is the quark. It is less than 10-20 m across which means a line of ten billion of them would be less long than a metre.

5. **What is the biggest thing in the universe?**

Ans : The biggest structure in the universe is The Great Wall-a great sheet of galaxies 500 million light years long and 16 million light years thick.

PROSE

A VISIT TO COX'S BAZAR

MD. ASIF BIN RASHID
College No: 2907
Class: IX (Day)

During last summer vacation I wanted to visit a place that I had never been to. So, I told it to my father and he agreed with me, though it wasn't decided where we would go. Then one night my father told me that we had never visited Cox's Bazar and that's a good place to spend a nice vacation in. And that night we made the plan of visiting Cox's Bazar. The plan was made and everything went on accordingly. On the 22nd of May we started at 10 am in the night. The bus was really comfortable as there was a TV in front of the bus and it was fully air-conditioned. I did not have a proper sleep that night as I was extremely excited. But I fell into a slumber in the last part of the night. When I opened my eyes, I enjoyed through the window some wonderful views of hills and mountains covered in shrubs and bushes. It was Chittagong. We arrived at Cox's Bazar in about 9 o'clock in the morning.

Then at about half past nine we went to a hotel. It was Hotel Ovisar. We booked a room. The room had two double-beds, an air-conditioner, a TV set, a set of sofa, a tea table, a toilet and a veranda. We took some rest. After that, my father said, "Who wants to go to the beach?" Everybody said, "yes" excitedly. We took towels and a camera with us. We walked from the hotel to the beach. It was a great experience for me to see the sea for the first time. Then we all had our bath in the sea. We also took some photographs. After spending an hour, we returned to the hotel room and washed ourselves. The funny thing that took place during my having bath in the sea was that I drank some salty water of the sea.

In the evening, we went to the local market. We bought some show pieces and gifts like hair bands, key rings etc. What was amazing about them was that all of them were made of shells and cores of the sea. Back to the hotel, we had our supper and went to bed early.

The plan for the following day was different. We went to a place called Himchori which was about 15 kilometres away from the hotel. We rented a car for that day. Reaching there, we became extremely happy. I was totally amazed at the beauty of the place as there were sea beach on one side and hills and mountains on the other. We took some photographs there. After spending about two hours there, we returned to the hotel. We spent the rest of the day watching TV in the hotel room. Then we went to bed at about 10 o'clock.

The next day was the last day in Cox's Bazar. In the morning, we went to the Burmese Market which was about 5 kilometres away from the hotel. We bought some bedcovers and show-pieces. After returning from the market, we took some rest and went to the beach for the last time. Then, at about 7 o'clock in the evening, we left the hotel. It was an emotional moment. Then at about 8 o'clock our bus started for Dhaka. Then I slept. When I woke up, I found that we had already reached Dhaka. Finally, I like to say that that it was an unforgetable experience for me. It will remain ever fresh in my memory as long as I continue to live.

FUNNY GIFT

MAHINUL ISLAM MEEM
College No: 2119
Class: IX (Day)

Once upon a time there was a greedy and bad ruler in a country. He used to do injustice to his people and exploit them. So, most people of the country did not like him. One day he was taking a walk by a river. While walking by the river, he came to a bridge, and as he felt tired he sat on the railing of the bridge. Accidentally he fell into the water. Three young boys who were fishing in the river saved him.

The ruler became very pleased with the boys. He expressed his gratitude towards them and promised to give them whatever they would want. He learnt from them that their names were Abir, Ezon and Rumi.

Ruler (pointing to Abir): What do you want?

Abir: I want to go to the Disney Land and buy some toys and books from there.

Ruler: No problem. My Air Force will take you there. What do you want (pointing to Ezon)?

Ezon: I really want some jerseys of different famous football players and boots of NIKE and ADIDAS.

Ruler: I'll get them for you and even with the signatures of the players on them. What do you want, little boy (pointing to Rumi)?

Rumi: I want a motorized wheelchair with a built-in TV and a stereo headset.

Ruler: But you don't look injured!

Rumi: My father would run after me if he found out that I had saved you from drowning.

A NIGHTMARE

SHOURAV BANIK
College No: 2283
Class: XI (Day)

He was running. He had nothing but fear inside him. He did not know what to do. There was devastation all around. Everything around him was burning. The buildings were destroyed. It was as if the Judgement Day had come. He looked behind. He thought that someone was chasing him. The figure was dark. He could not see him entirely. But he could see the figure's red eyes. It looked like the devil himself. He tried to run faster. But as he tried he tripped down. He fell on the ground. But there was no dust there. There was blood. He became very afraid. He stood up somehow. And again he began to run. He went into a building. Inside the building he saw a man. But he knew this man. He thought he had seen him before. Then suddenly the man spoke, "You killed me yesterday. But I did not want to die. And now you will receive your punishment. Now you will die. Just like me. Remember how you tortured me. I was screaming, but you did not stop. And now you will suffer in the same way." "No, no, let me go," he yelled. But it did not work. The man came forward. He had something in his hand.

And then ….

CELEBRATION OF SPECIAL DAYS!!!

MD. FORHAD HOSSAIN
Demonstrator, Department of Geography

In the present age of globalisation we celebrate lots of special days as the other countries do. Some of these are declared by the United Nations or other international organizations for special purposes and objectives and some other days declared by almost anonymous groups which have very precise and thematic meanings but celebrated enormously specially by the young generations. The World Environment Day, the Population Day, the Women's Day etc. have been declared the special days considering their importance and relevance. The truth is that a very large number of our young people are not actually aware of these days and they don't even seem to care about them. But when a day becomes a universal day of celebration, for instance, the Valentine's Day, the Friendship Day or the 31st Night, etc, it becomes a universal day of celebration and enjoyment to them. Private radio and TV channels arrange talk shows and outdoor programmes. Special discounts in the food courts, free movie tickets for couples, mobile phone company's mega offers, outdoor stage shows and concerts, hotel ballroom party and much more mind-blowing offers are given by business and profit-making capitalist societies spreading these concepts to sell their products and services and bringing a uniform culture into the world. They don't even bother if it comes into conflict with particular cultures, beliefs and morality. These special days are always misinterpreted to our young generation for Business Corporation's own profit-making benefits.

People always look for an excuse or opportunity to do something that their inner minds want to do. Man is by nature driven by his instincts. Religion, laws of society and state rules restrict these instincts to a certain binding to some extent. Still the young heart tries to go beyond these restrictions. The Valentine's Day, the Friendship Day, Pahela Baishakh, the 21st February, the Bashanta Utsav or what-so-ever day brings no actual significant meaning to a large number of young people. They only want to enjoy these special days with lots of fun as their inner minds are controlled by their powerful instincts. Going outdoors and roaming around with girlfriends or boyfriends, giving cards or special gifts, eating together in the food courts, bars or restaurants, wishing and exchanging messages among friends – these are all nothing but the expression of their instincts that their inner minds want to enjoy on the plea of celebrating that particular day. It is not the significant meaning of the Valentine's Day or the Friendship Day that compels them to commemorate the day; it is only the excuse.

I don't consider myself a pessimist or sceptic; what I mean to say is that the way we celebrate these particular days is not right. We have to understand the significance of such special days as well as other important Days observed across the world. Our young generation is being led to the wrong point by globalised enterprises and media. But I admit that it is well-nigh impossible to effect any change in the ongoing trend.

DON'T ASK ME WHY

PRASUN GOSWAMI
Lecturer
Department of English

'Papa, why are all those men sitting on the road with their heads down?' Little Antu. My son. So young. So charming. Simply adorable. I just could not help loving him. Looking at him, in a bright red tee-shirt, with lovely streaks of colour and dark black shorts, a blue cap and soft caring sports shoes, I realised that I was looking at my own blood. I was amazed – amazed at the thought that my blood could take such a beautiful shape. I felt like crying and jumping in joy to tell the world, 'Look! Look here! This is my son and I am a proud father.'

Yet the centre of my ecstasy could not comprehend the glow on my face. He tugged at my kurta to make me stop looking at him and start seeing him. He blurted, 'Papa, tell me why they are kneeling on the road.'

'Son,' I answered, 'because today is Eid. It's a holy occasion – a festival of Muslims. They are praying to God.' 'But why don't we pray with them?'

'Because we are Hindus and our way of praying is different. Every religion has its own way of praying to God.'

'But why do they have to pray on the road? Isn't it dirty?'

'Because so many of them are there. There is no other place. And they don't get dirty because they pray on a mat.' 'The road is blocked. How will the cars go?' Antu and his hows, and whys, and whens, and wherefores. No, I was not tired. I simply relished them. I loved the interaction. I had plenty of them on these second Fridays of the month. They cleansed the barrenness of the whole month. I wished I had more of them. Antu kept asking questions and I kept answering them. I remained prepared to be encountered by a further battery of queries. Time passed on like a wave of melodious music. We strolled carelessly like two free bees in the mysterious maze of life called a city. Through the thoroughfares, wandering in the parks, beneath the high-rises and under the umbrella of the blue sky we had our Friday morning stroll.

We returned home for lunch. I insisted that on such days we should treat ourselves to the clatter of fine cutlery in some fashionable, air-conditioned and dimly-lit restaurant. But Antu impressed upon me that the real pleasure was in a homemade diet. So, I had the pleasure and privilege to plan the course in advance. I wasn't a good cook myself, or true to say, I never liked to work hard at something I would consume all on my own. That is possibly the way with all the cooks in the world. Yet, Antu called for an exception. I gathered all my strength and might into the kitchen. Down went the pen and paper. Up came the ladles and spices all in an effort to provide Antu with the cream and the very best of my affection. The Herculean effort extended even beyond the kitchen. It spread all over time and space.

I strived towards only one goal – to see a smile on Antu's face and to see him happy. It had come to this that to see Antu happy had become my sole concern, my sole ambition, the driving force in my life. In such moments of utter bliss the heart skips a beat. It is as if there is the click of a shutter deep down in the soul. The heart takes a snap of the moment to restore it forever caringly in the albums of memory. From time to time this album would be opened to go through and recollect those days of the past. My album was rather a thick one. Yet there were many slots, still waiting to be filled in.

'You know, Papa,' Antu started his praise, 'you are a much better cook than Mama.'
'Don't tell me that,' I protested. 'You will go and tell Mama just the opposite.'
'No, I will tell her the same thing.'
'Antu.....'

I tried to call him to attention, as if I had got some important matter for discussion.
Antu looked up, still licking the last remains of the *dal* from his fingers.
'Do you love Mama?'
'Yes,' answered Antu promptly.
And contemplating the sudden solemnity, set in by my question, he decided that the best way to break the tone was to use a boomerang.
'Do you .....?'

Somehow I was waiting and wishing that he would ask this question.
I wanted to express myself to somebody who was someone to me. 'I love your Mama very, very much. It's just as I love you. You know something, Antu. Mama is not someone separate from me. You know we are one person. I find in her some definite attachment which I cannot describe. I do not know it even myself. I have never been able to explain why I love your Mama. Right from the first time I saw her I knew, a voice deep inside me or from a distant land far from this earth told me that she was my partner. Since then, for a single moment even, I have never stopped loving her.'
Antu gazed in amazement. Perhaps my eyes were filled with tears. Was he amazed at the prospect of his Papa crying or did my words make him move? I suppose it was the second. He is my son and so I know of him.

We had little rest before we had to leave. Antu took a little long to tie his shoe-laces. Glancing at my wristwatch, I concluded there wasn't time enough to reach the metro station at the appointed time. I gave up the idea of travelling by bus and decided to hire a cab.
In the cab Antu was silent. He was busy recording the roadside images fleeting past his eyes into the tiny little brain of his. The recording lens of his eyes was perhaps disturbed by a delicious focus – a brilliantly painted parlour. He demanded in an unputdownable tone, 'Papa,
I want an ice-cream.' I was for an instant elated with the prospect of satisfying him. But the prospect of being late crossed my mind. I tried to avoid it.
'We will be late, Antu. Mama will be waiting for us at the station.'
'Papa, please,' Antu was persistent.

'No,' I made a second desperate effort, 'Mama will be angry. Didn't you have a cold last week?'
'Will you tell Mama?' he stared at me with sad eyes. 'I will finish it off quickly.'
The father in me gave in and Antu had his Butter Scotch.

Esha was waiting for us near the counter. We exchanged a few usual words. I learnt that Antu and Esha had planned for some shopping to end off the day. I let Antu drop the coins into the ticket vendor. He enjoyed the task even though he had to strain his calf muscles a bit. We did not have to wait too long. The train chugged in smoothly. The sparks at the wheels provided Antu with the usual entertainment. The doors opened and we went in. Stations went by. No one spoke. The microphone blared away mechanically. Leaning against his Mama's shoulders, Antu was resting. My heart took a snap. Another space in my album was filled in. Yet a lot remained empty.

The speakers pronounced the approach of their destination and Esha got up and proceeded towards the door. Antu chained to his Mama's arms followed suit. His eyes were turned towards me. In agony of another month his heart ached, or was it mine? It did not matter; it was all the same. I still had to get used to these moments of separation. It was as if iron pliers were tearing apart my heart from the sinews and the veins without any consideration. I was being torn apart. Esha looked away. Nothing mattered to her. Did I say nothing that was all I was worth to her? How easily vows are broken.

The train went on. I was in an illusory world. The terminal arrived. I got off. I ran to the escalator. I chose the left one – the one that was meant for people who were to come down. I ran up the opposite way. I could have fallen and been caught in the spikes. I did not care. The people around me stared in complete disbelief. They thought I was mad. I did not protest. I was mad. Yes, I was. I wanted to shout, "Look! My blood is gone, I am bloodless ...... do I look like a chicken?' But I could not. Something blocked my voice.

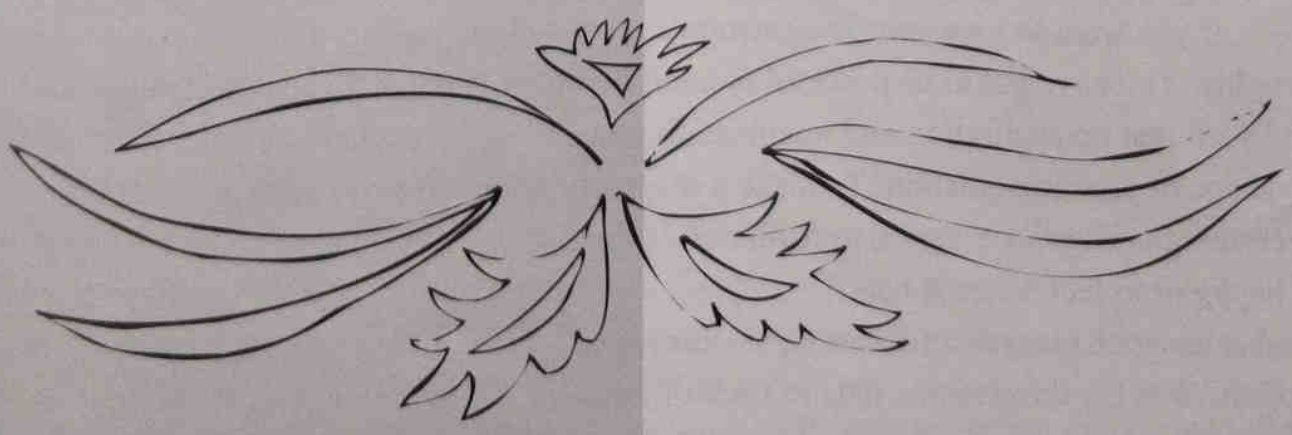

Shape of our Imagination

Mirza Tanbira Sultana
Lecturer
Department of Fine Arts

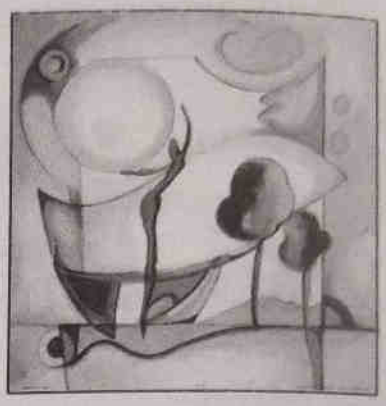

When you feel something deep within and can't express, it becomes abstract. Abstraction is the form of reality of life. When we can't define our life properly our expression becomes abstract .We need to find out what is going on inside ourselves. Define our inner self and give form to our feelings .Right now am I feeling happy? Sad, or lonely. Do we know that surely every time? Ask yourself, and then tell yourself the answer. You will see how happy you can make yourself by giving yourself the proper answer. Besides happiness there are other feelings which make us feel good. That is Art of life. Art is the aesthetic value of our mind .If we can do things proportionately it becomes an Art .Now the question is how we will do things in proportion .

We need to measure out how far our life can take . As far as we are concerned, we want to be happy and peaceful in our mind. Mind is the body of our soul. Soul is the spiritual shape of our thoughts. Thinking is the power of mind. Imagination is the figure of our thoughts. So we can give our imagination a big shot. As we have all our liberty to think as we wish, we should colour our imagination as soulfully as ever. So give as much colour and shape to your imagination as possible.

If you want to give your imagination a proper shape you need to concentrate on your thoughts .You have got to be peaceful in mind first then you can give soulful concentration. And with that concentration and imagination you can make your life artistic which will be the shape of your imagination .To make a shape of our thoughts we need space in our mind. Everything needs space .Space to realize and think. What do we want to be actually? Is it to be happy or to feel better at heart?

From a distance everything seems right, seems perfect. But when we come closer out of our proportion every thing seems fade in front of our eyes. So for the perfect shape and colorful image of our imagination we need the distance. Distance between the power of our soul and the imagination .With that distance we will shape our imagination.

HOW DID I LEARN ENGLISH ?

MD. MOSTAFA
Assistant Professor
Department Of English

I was born in a very poor family. My parents didn't have any hope that I could go to school for study. They were very poor even to feed me at that time. Sometimes I had to pass one or two days without food. All those times I used to look at the boys of my own age who went to school and I made up my mind that I must go to school like those boys. My father had no money to buy me books, pencil and paper. That is why I decided to work for earning money. It was 1966, then I was a little boy of 6 years old and fortunately I got a work to break bricks to small chips with a hammer nearby my house. These chips were used for construction.

One Friday morning I started to break with a hammer and next Firday (after 7 days) I got one rupee as remuneration. I became very glad and went to a book-stall. I bought Sabuj Sathi-a beginner book in Bengali with 75 paisa and a pencil for 25 paisa. The next day I went to school for admission and I was admitted in the primary school in class one. I studied very hard and put my heart and soul in my study. As a result in the final examination I stood first in the class. Next year (1967), I could hardly read any English but in the final examination I stood first. After that I went to study in Thakurgaon Govt. Boys' School. So, I appeared at the admission test in class three (III) In that admission test 36 students took part where I stood first. My father wanted me to study in that school but he had no money for my admission fees. He wanted rupee 10 as a loan from one person who told my father to meet him later on. I heard it and requsted my father not to take loan for my admission fees. Respectfully I told him that I would not study in the new school and I went back to my old primary school where I studied up to class five (V). Again I appeared at the admission test in class Six (VI) in Thakurgaon Govt. Boys' High School in the year 1971.

In the admission test in class VI, I got the following number on the subjects mentioned below:

Subject:	Full Marks	Marks Obtained
Bengali	50	35
Mathematics	50	48
English	50	10

So, I failed in English in the admission test and that was the strongest pillar of my success in learning Englsih.

The renowned Headmaster Mr. Rustom Ali Khan advised me cordially to study the English books from Class III-VI attentively. I gave him my word to do as I was advised by him and I kept my word and I began to learn English in the real sense. You believe me or not but I would like to inform you gospel truth that just after coming back from school I used to eat rice (if there was no rice) I used to take a glass of water to ease my hunger and then I used to read English (The H.W)

After completing my English homework I used to take rest and the rest I used to take after learning my homework was so comfortable that I think now, it can be compared to heavenly rest. Actually, at High School level I was encouraged by my noble teacher Rustom Ali Khan (The Headmaster of Thakurgaon Govt. Boys High School) He inspired me to learn English. So a teacher in the real sense can turn a weak student into a strong student in any subject.
Actually, I began to learn English at High School Level. I was regular in my class. I used to listen attentively to the teachers in my classroom, specially the English teachers. In the final Exam of class VI, I obtained 65 marks in English Ist paper and 70 in English 2nd paper. In class VII I was elected captain of my class. So, I became more careful to do better in my studies- specially in English. Next year I was promoted to Class VIII.

In Class VIII, I made up my mind to appear at the scholarship examination. So, I wrote a letter to my Mathematics Teacher and gave it to him while he was going out of the class. He stood under a Krishnachura tree and went through the letter. He assured me to teach mathematics and he would also request the English teacher to teach me privately so that I could get the scholarship which would be very helpful for me.

I would like to mention the names of those great teachers also. They were Mr. Khalilur Rahman (Maths) and Mr. Hafiz (English). Both the teachers took care of me. They encouraged me to get full preparation for the scholarship examination. As I was a poor student they did not take any remuneration for teaching me privately. I am really grateful to them. I will never forget them. To me they are no less respected person than my parents. Actually, those two teachers helped me to build up my student life. In the year 1973 I appeared at the Junior Scholarship Examination. After that I had been waiting for the result. One day I became very sad to see that my mother had only one sharee (dress) to put on. Then I decided myself that I must get the scholarship and also I must buy new sharee for my mother. Just after a week the result of the Junior Scholarship came out and I got talent-pool Scholarship. I became very happy. After one month I got Tk. 300/- to buy books for class IX and X. Then and there I went to market and bought a sharee for my mother. My mother got the sharee and prayed for me from the core of her heart so that I could be a man in the real sense.

In the year 1974 I was promoted to class IX. I studied science. Later on I appeared at the S S C Examination held in 1975 from Science group. But it was bad luck for me that I failed to get 1st division for want of 5 marks only. I obtained 595 marks, because, I had to teach lower calsss students privately to earn money in order to provide and protect my family from hunger. So I could not give enough time for study. However, in the year 1976 I got myself admitted in class eleven in Thakurgaon Degree College. I could not study science any longer. So, I began to study in Humanities group (Arts) In the year 1971 I appeared at the H.S.C Examination and was placed in the Second Division. Next year in 1978, I got myself admitted in B.A. In the year 1979 I appeared at the B.A. Final Examination and was placed in the 2nd class. Fortunately, I obtained 50% marks in English and this was the first record marks in English in the History of that college In B.A. (pass) Examination. This record is still unbroken.

Later on I came to know that 50% marks in English was the highest marks in the B.A. pass examination under Rajshahi University in 1979. So, this very 50% marks in English in the B.A. pass examination helped me and was the turning point in my life. Actually I got chance to study English Literature in the University of Dhaka due to this very 50% marks in English in B.A. pass Examination held in 1979 under Rajshahi University.

I have a class friend named Shanto whose father was cordial towards me. His name was Mr. Lal Chacha. He was a rich man. He liked me very much. It was he who took me to Dhaka kept me with his own family and helped me to get myself admitted in to Dhaka University. He took me to Dr. Sirajul Islam Chowdhury and introduced me to him. He (Dr. S. Islam) became happy to see 50% marks obtained in English. I began to study English Literature in the University of Dhaka which was beyond my dream.

Afterwards, I was helped by another class friend Shishir Kumar Vottacharya who provided me to stay with him in the Arts College Hostel. At present, he is serving as an Associate Professor in Institute of Fine Arts, Dhaka University.

I am grateful to him. While I was staying in the Dhaka Arts College Hostel near New-Market, I had been looking for private tuition or part-time job. Fortunately, I noticed a notice on the notice board in the English Department. I went through the notice and came to know that the English department students would be given part-time job. I became very happy to get the news. In the notice, we were advised to meet with Dr. Niaz Zaman for the details. Accordingly I met with her at her office and informed her about my poor condition. She listened to me very cordially. Finally, she assured me that I might get a part-time job. Next day I met with her again with my papers. Later on, she advised me to meet with the director of T.S.C (Dr. K. Ali) for part-time job. I met with the director and he gave me a part-time job. The job was of an Electronic meter reader in Old Dhaka. I could continue the job for 3 months only. After that I could buy my books and China bicycle for private teaching. I bought a cow for my family which gave milk. My younger brother used to tend the the cow and sell the milk in the market. Then he bought rice with that money. In this way I tried to help my family financially.

At that time I used to ride the bicycle and teach 5 students privately. I earned more than three thousand taka per month. I spent Tk. 1000.00 for me and sent Tk. 2000.00 for my parents. Thus I earned money and learned English. I used to stay in Sir. A.F. Rahman Hall. I was allotted a seat in that Hall. My roommates were very co-operative. We used to speak in English so that we could improve our speaking capability in English. Last of all, I appeared at the M.A. Final Examination in English literature. After 3 months our result came out and I got 2nd class. Thus I passed my University student life mingled with sorrow and happiness. After that, I had been looking for a job and applied for the post of a lecturer in English in Dhaka Residential Model College in 1984. Here my teaching life started. I had been serving in this institution as a lecturer in English for 18 years and now I have been serving as an Assistant Professor for more than 5 years.

A FEW SIMPLE WORDS

A. B. M. SHAHIDUL ISLAM
Vice Principal (Day)

Human mind is the most cryptic entity on earth. It has its own ways to follow own means to justify its ends. The endless waves of currents and cross-currents that flow eternally in its conscious and subconscious levels are so multi-dimensional that even a fathomless ocean with all its mysteries seems futile in comparison. The actions and reactions of human mind are so full of intricacies and delicacies that even the wisest sages of the world have failed to predict anything about the strange play of human mind. Anyway, here we shall not philosophise on human mind nor shall we try to unearth the mysteries of it. Let us leave the task to the best minds, to the divinely gifted saints and philosophers of the world. We shall simply look at some usual scenes of day-to-day life and see how we act and react under different circumstances and how *Confidence* play a vital role in it.

You perhaps know that like other virtues *Confidence* is an important element of human personality. *Confidence* is a mental power which makes you simple and credulous as far as your demeanour is concerned. And *Credulity* which is an off-spring of simplicity flows from *Confidence*. The seed of *Confidence* is buried deep into the womb of honesty– the indescribable mighty pillar of strength of human character. You need to bring it (the seed) to light; tend it carefully to help it grow gradually. You also need to weed out the impediments that tend to hamper its growth. This is where true education like a sharp weapon comes to help you. So, receiving true education which broadens our outlook and enlightens our soul is an all important factor. As young learners if you carefully take care of yourselves listening to the advice of your wise elders, you will see that you have been able to have *Confidence* built up in you, and once acquired, this virtue will act as a touchstone in all affairs of your life. You will have that mental strength which will enable you to rejoice over simple things. And this mental state will prove to be more than a blessing because the power that *Confidence* has in it will save you from the heinous bites of unnecessary doubts and suspicions and misunderstandings which trouble most people. You know a person devoid of *Confidence* and self-respect can easily demean himself even for a cheap personal gain, but a person having self-respect and *Confidence* in himself will never do it. So, building up *Confidence* during your growing up stage should be one of your chief concerns.

Confidence has its positive impact in all affairs of our life. Not having it does have one impact and having it has surely the other. Let's look at a very simple event and see how it fixes our actions and reactions. If a person not very intimate to you and most importantly in whom you don't enjoy any *Confidence* utters everything at you in an abusive language it will ignite your anger and you will feel like paying back in the same coin. On the other hand, if your loving parents or teachers or anyone else very intimate to you do the same thing, you will never think of any sort of retaliation because you know that the person or persons are but your sincere well-wishers who want to correct you and see you in a good shape. Here your *Confidence* and trust in the person concerned determines your reactions. Your instinct gives you the inner message. You confidently believe that your loving well-

wishers never mean by what they say. You can see through their abusive words the silver lining of their love and affection.

Sometimes a small piece of work requiring a little time might seem monotonous, tedious and heavy when you don't have an environment where you can enjoy mental peace, mutual trust and *Confidence*. On the contrary, heavy works requiring a lot of time and energy may not seem to be heavy if you get a congenial environment where you can share full trust and *Confidence* with the persons you work. That's how circumstances fix your mental state that prompts your actions and reactions

So, as young learners along with your must-do-activities, you need to try to build up *Confidence* in you. This mental power and a discreet sense of judgement will go a long way to save you from the purposeful deal of the tricky liars, spineless flatterers and unscrupulous cheats. People lacking in *Confidence* re-sort to tricks and other means that demean their status as human beings. You won't have to do that if you have honest spirit and confidence. Nothing is more valuable than a living worthy of real praise and honour.

শাশ্বত বাণী

- মিথ্যার আবরনে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করো না, আর জেনে শুনে সত্যকে লুকাবার চেষ্টা করো না। –আল কোরআন
- প্রকৃত সাহসী তারা– যারা সাহস না হারিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারন করে। – আল কোরআন
- মানবতাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুন। – আল হাদিস
- যারা শিক্ষা লাভ করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে তারাই প্রকৃত বিদ্বান – আল হাদিস
- নিজের বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে উদ্ধার করো, আত্মাকে কখনও নিচে নামিয়ে দিও না। –শ্রীমদ্ভগবৎগীতা
- দেহ, বাক্য ও মন –এসব বিষয়ে সংযত থাকাই শুভকর। –ত্রিপিটক।
- ধন্য সেই ব্যক্তি– যে দুষ্টদের মন্ত্রনায় চলে না, পাপীদের পথে পা বাড়ায় না, নিন্দুকের সভায় বসে না। –বাইবেল
- পৃথিবীতে মানুষের কেবল তিনটি জিনিসের প্রয়োজন– বই, বই এবং বই।– টলস্টয়
- অসৎ আনন্দের চেয়ে পবিত্র বেদনা অনেক মহৎ। – হোমার

স্মৃতিরা
পোহায়
রোদ্দুর

নব নির্মিত ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যক্ষপত্নী মাহবুব আরা জামানের হাতে ফুল তুলে দিচ্ছে এক শিক্ষার্থী

নব নির্মিত ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষের হাতে ফুল তুলে দিচ্ছে একজন ছাত্র

২০০৯ সালের এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থীদের সাথে কয়েকজন শিক্ষক

এস.এস.সি পরীক্ষা-২০০৮ এর ফলাফল প্রকাশের পর উল্লাসমুখর ছাত্রদের মাঝে অধ্যক্ষ

এইচ.এস.সি পরীক্ষা-২০০৮ এর ফলাফল প্রকাশের পর উল্লসিত ছাত্রদের মাঝে অধ্যক্ষ

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কলেজের সহকারী অধ্যাপক সাবেরা সুলতানা

সুন্দরের স্বপ্ন আয়োজনে নিঃশ্বাস নিঃশেষ হোক পুষ্প বিকাশের প্রয়োজনে

শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২০০৮ এর সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল মোঃ কামরুজ্জামান খান

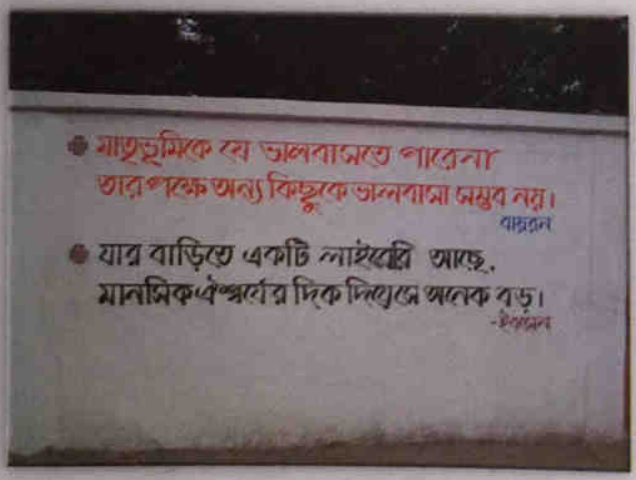

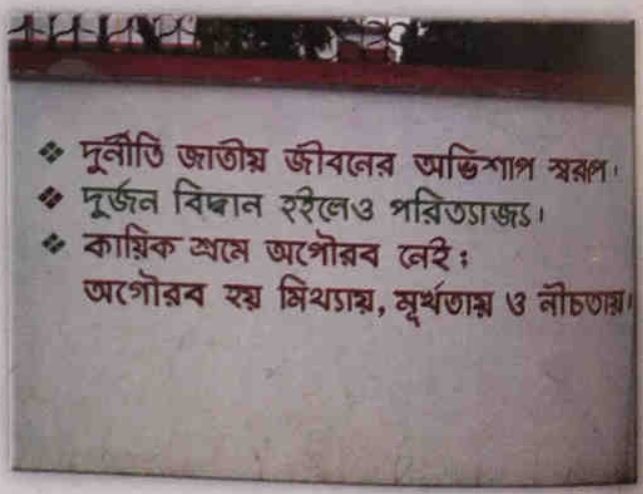

অধ্যক্ষের দিক্‌নির্দেশনায় কলেজের সীমানা প্রাচীরে চারু ও কারুকলা বিভাগ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র ও বাণী

উৎকর্ষ সাধনে অদম্য
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বার্ষিকী
'সন্দীপন' এর আত্মপ্রকাশে আমাদের অভিনন্দন

ভেবেছেন কি কখনও..আপনার সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশে
একটি খেলার মাঠের প্রয়োজনীয়তা কতটুক ?

ADVANCED DEVELOPMENT TECHNOLOGIES
For A Beautiful Tomorrow

ADVANCED CENTRE : 176 Gulshan Avenue, Gulshan North, Dhaka-1212
Phone: 8815323, 8811923, 9884746, 9896455, 8813042, 8813046, 8813047, 8821692 8821749, 8821988 9861434, 9884745
Mobile: 01819-558015, 01819-558022, 01819-558010, 01819-226568, 01819-226569, 01819-558014, 01819-558016, 01819-222303 01819-558023, 01819-558024, 01819-226567, 01819-558011, 01817-141303, 01819-226668, 01819-222314, 01819-558021
Fax: 88-02-8810788 **E-mail:** info@advanced-bd.com, angelcity@advanced-bd.com **Web:** www.advanced-bd.com

ACADEMIC BUILDING - I